ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের বহুমুখী ষড়যন্ত্র মুসলিম উম্মাহর করণীয়

মাওলানা তাফাজ্জুল হুসাইন গাজীপুরী

কুরআন-হাদীসে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের পরিচয়

ইয়াহুদী জাতি পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি। আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ আ. এর পর হযরত ইবরাহীম আ. কে সর্বপ্রথম সারাবিশ্বে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তারই দুই সন্তান থেকে পৃথিবীর ঐতিহাসিক দু'টি জাতির সৃষ্টি হয়। হযরত ইসহাক আ. থেকে সৃষ্ট হয় হাজার হাজার নবী এবং বনী ইসরাঈল তথা ইয়াহুদী জাতি। তার অপর সন্তান হযরত ইসমাঈল আ. থেকে সৃষ্ট হয় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলিম জাতি। কুরআন যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জীবন ব্যবস্থা এবং পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সারাংশমূল, তাই কুরআনুল কারীমে দুনিয়ার প্রবীণ জাতি ইয়াহুদীদের ঘটনা সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে। যেন এসব জাতির ইতিহাস শুনে উম্মতে মুহাম্মদী ভুল পথ থেকে বেঁচে থাকে। যেমন সূরা বাকারার ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বনী ইসরাঈল! তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি এবং তোমরা আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করবো। আর তোমরা আমাকেই ভয় কর'।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বনী ইসরাঈল! আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমদেরকে দিয়েছি এবং স্মরণ কর আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সূরা বাকারা; আয়াত-৪৭/১১২)

বনী ইসরাঈল মূলত হযরত ইয়াকুব আ. এর বংশধর। হযরত ইয়াকুব আ. এর হিব্রু উপাধি ছিল ইসরাঈল, যার অর্থ আল্লাহর বান্দা। এ কারণে তার সন্তানদেরকে বলা হয় বনী ইসরাঈল বা ইসরাঈলের সন্তান। বনী ইসরাঈলের ধর্মীয় নাম ইয়াহুদী বা আহলে কিতাব। উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের প্রতি সর্ব প্রকার নেয়ামত প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা, তাদের বংশে অধিকাংশ নবী পাঠানো, নবীর আওলাদ হওয়া, অজস্র ধন-সম্পদের মালিক বানানো, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান, আসমানী কিতাব তাওরাত প্রদান , আসমানী খানা মান্না-সালওয়ার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। বোঝা গেল, দুনিয়া-আখেরাতের সকল নেয়ামত ও সুখ-শান্তি দিয়েই আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সকল ব্যাপারেই তারা নেয়ামতের নাশোকরী করেছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা গোবৎসকে প্রভু রূপে গ্রহণ করেছে তারা অচিরেই তাদের প্রতিপালকের ক্রোধের পাত্র হবে এবং দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত অপমানিত হবে। আর এভাবেই আমি মিথ্যারোপকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। (সূরা আ'রাফ- ১৫২)

তাফসীরে কুরতুবীতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, হযরত হুযাইফা রাযি. একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইতুল মাকদিসের সেই মনি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যেগুলো জিনদের মাধ্যমে সংগ্রহ করে হযরত সুলাইমান আ. বাইতুল মাকদিস নির্মাণ করেছিলেন– সেগুলো এখন কোথায় আছে? হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, যখন বনী ইসরাঈল আল্লাহর অবাধ্য হল, পাপ কাজে লিপ্ত হল, নবীদেরকে হত্যা করে ফেলল, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বুখতে নছর বাদশাহকে চাপিয়ে দিলেন। সে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করল, আর মহিলা ও শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করল এবং বাইতুল মাকদিসের সমস্ত সম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাজার উট বোঝাই করে আপন দেশ বাবেলে নিয়ে গেল। একশত বছর পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদেরকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে লাঞ্ছনাদায়ক কষ্টকর কাজ নেয়া হল। (তাফসীরে কুরতুবী ১০/২২২ শামেলা সংস্করণ) উল্লেখিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, ইয়াহুদীরা সর্বপ্রথম ঈমানদার জাতি ও আল্লাহর বন্ধু ছিল। কিন্তু চরম নাফরমানীর কারণে তারা উক্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত এবং চির জীবনের জন্য অভিশপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এই অভিশাপ তাদেরকে হীনমন্য ও নিকৃষ্ট জাতিতে রূপান্তরিত করেছে। অতঃপর শয়তান যেমন অভিশপ্ত হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর বান্দাদের শত্রুতার লাইসেন্স গ্রহণ করেছে ইয়াহুদীরাও আল্লাহর বান্দা মুসলমানদের স্থায়ী শত্রুতার মিশন হাতে নিয়ে মুসলম নিধনের বিভিন্ন অপকৌশল চালিয়ে আসছে। তাদের ষড়যন্ত্রের কিছু পরিকল্পনা নিম্নে আলোচনা করা হল-

ঈমান-আমল ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বনাম ধর্মান্তরিত করার অপকৌশল

ইয়াহুদী ধর্ম একটি ঐতিহাসিক বংশীয় ধর্ম। তাদের মধ্যে বংশীয় আভিজাত্য এতটাই প্রকট যে, নিজেদের ঔরসজাত সন্তান ব্যতীত অন্যদেরকে তারা ইয়াহুদী বলতে নারাজ। এজন্য এ ধর্মে অন্যকে ধর্মান্তরিত করার সুযোগ ও অনুমতি নেই। এ কারণেই সারা দুনিয়ায় তাদের দুরভিসন্ধির বিস্তৃত নেটওয়ার্ক দেখা গেলেও তাদের জনসংখ্যা বা ধর্মানুসারী খুবই কম। তাদের সকল অপকৌশল বাস্তবায়নের মুখপাত্র হল খ্রিস্টান ও মুশরিক জাতি। ইয়াহুদীরা নিজেরা কাউকে ধর্মান্তরিত না করলেও ধর্মান্তর কাজে খ্রিস্টান মিশনারীদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের নীলনকশা তারাই প্রস্তুত করে দেয়

এবং তা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদান করে। (সূত্র: ইহুদী জাতি ও ইসরাঈল রাষ্ট্র)
দেখা যায়, সারা বিশ্বে যেখানেই মুসলমানগণ একটু সচেতন, ইসলাম অনুযায়ী জীবন যাপনে কিছুটা সচেষ্ট– সেখানেই এরা নিজেদের লোক তৈরির লক্ষ্যে সেবার নামে, চিকিৎসার আড়ালে ধর্মান্তরের কাজ আঞ্জাম দেয়। আমাদের দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, নেত্রকোণা এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো নিয়ে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের প্ল্যান-প্রোগ্রাম ও ষড়যন্ত্রের কথা শোনলে বিবেকবান মানুষের ঘুম উড়ে যাওয়ার কথা।
বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক রিপোর্টের ভিত্তিতে ১০ আগস্ট ২০১১ তারিখে *দৈনিক ইনকিলাব*-এ 'খ্রিস্টান বানানো হচ্ছে উপজাতিয়দের' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে,
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪৫টি উপজাতির অস্তিত্ব রয়েছে। এর মধ্যে তিন পার্বত্য জেলায় রয়েছে ১৪টি উপজাতি। উক্ত উপজাতিদের মধ্যে ৩০.৫৭ ভাগ চাকমা, ১৬.৬০ ভাগ মারমা, ৭.৩৯ ভাগ ত্রিপুরা, ৬.১৬ ভাগ অন্যান্য উপজাতি। আর অবশিষ্টরা হল বাঙ্গালী। পার্বত্যাঞ্চলের এ তিনটি প্রধান উপজাতির মধ্যে প্রথাগতভাবে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী বেশি ছিল। আর তার পরের স্থান ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের। বলতে গেলে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের অস্তিত্বই ছিল না। গত দুই দশকে উল্লিখিত জেলাসমূহে খ্রিস্টান ধর্মের বিস্তার ঘটেছে অবিশ্বাস্য হারে। যার একটি পরিসংখ্যান গত ৬ জুন ২০১১ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়। বান্দরবান জেলায় এখন মুসলমানের সংখ্যা ১ লাখ ৪৭ হাজার ৬২ জন। খ্রিস্টানের সংখ্যা ১ লাখ ৩ হাজার ৭৯৬ জন। দু'দশক পূর্বে এ জেলায় বৌদ্ধদের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও এখন তারা সংখ্যায় তৃতীয়। মাত্র বিশ বছরের ব্যবধানে এখন খ্রিস্টানরা অনেক অগ্রগামী।
ইফাবার প্রতিবেদনটিতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলার গেলাইঙ্গা, রেমাকৃপাংশা, ফাইন্দু ইউনিয়নে এক সময় খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও কিছু হিন্দু পরিবার বাস করত। অথচ মারমা ও বোম উপজাতি অধ্যুষিত রুমা উপজেলার এখন ৬০ ভাগ জনসংখ্যাই খ্রিস্টান। রুমা বাজার থেকে ৫ কি.মি. দূরে আশ্রম পাড়ায় একবার ৪/৫টি ত্রিপুরা পরিবার পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তারা আর্থিক দৈন্যদশায় পড়ে মুসলমানদের থেকে নিরাশ হয়ে এক খ্রিস্টান মিশনারী চার্চের দারস্থ হয়। খ্রিস্টান মিশনারীরা এসব নওমুসলিমদেরকে বিভিন্ন সেবা ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কৌশলে খ্রিস্টান বানিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, তারা যদি কোনভাবে কোন উপজাতির মুসলমান হওয়ার কথা শোনে সাথে সাথে নিজেদের বাহিনী দিয়ে তাদেরকে খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলে। এটা শুধু একটি ঘটনা নয়; এমন হাজারো-লাখো ঘটনা অহরহ ঘটছে। (সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব; ৪ জুন ২০১৪ খ্রি.)
তারা তাদের নীলনকশা বাস্তবায়নে পাহাড়ী বিভিন্ন সংগঠন এমনকি সরকারী বাহিনীকেও প্রয়োজনে কাজে লাগাতে তৎপর।
গত ২ জানুয়ারী ২০১৩ তারিখে ঢাকা শহরের বাসাবো এলাকার এক মাদরাসায় তল্লাশী চালিয়ে পুলিশ ৫জন উপজাতিয় নওমুসলিম অভিভাবক এবং তাদের ১৬জন সন্তানকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। তারপর তাদের ইসলাম গ্রহণের এফিডেভিট ও অন্যান্য কাগজ-পত্র দেখে ১১জন শিক্ষার্থী ও ৫জন অভিভাবককে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ৫জন ছাত্র পূর্ব থেকেই মাদরাসায় পড়াশোনা করত তাই তাদের অভিভাবক ছিল না। অভিভাবক আসা পর্যন্ত তাদেরকে তেজগাঁও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে রাখা হয়। পরবর্তীতে অভিভাবকরা তাদের আনতে গেলে ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফোরামের সদস্য পরিচয়ে কতিপয় উপজাতিয় লোক থানার সামনে থেকে তাদেরকে জোর করে নিয়ে খ্রিস্টান এন.জি.ও'র কাছে সোপর্দ করে। কত বড় স্পর্ধা! শতকরা ৯০ভাগ মুসলমানের দেশে নওমুসলিমদেরকে মাদরাসা থেকে ধরে এনে খ্রিস্টান চার্চে দিয়ে দেয়া আমাদের জন্য কতোটা লজ্জাকর বিষয়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীরা এখন এতোটাই অপ্রতিরোধ্য যে, গত ১৫ মার্চ ২০১৪ তারিখে বান্দরবান ফাতিমা রানী চার্চে মহিলা হোস্টেলের মেয়েদেরকে মিশনের ফাদার ও ব্রাদার কর্তৃক যৌন হয়রানীর অভিযোগ উঠেছে। এরা সবাই বান্দরবান ডনবাস্কো উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম থেকে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী। গত ১৫ মার্চ ৭১জন ছাত্রী নদীতে গোসল করার নামে হোস্টেল থেকে বের হয়ে পালিয়ে গেলে ঘটনাটি স্থানীয়রা জানতে পারে। ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এমনকি এই সংবাদ বাংলাদেশের কোন জাতীয় দৈনিকে আর ছাপা হয়নি এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। (সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব; ৪ জুন ২০১৪ খ্রি.)
খ্রিস্টান মিশনারীরা কেমন অপ্রতিরোধ্য গতিতে ধর্মান্তরিত করার কাজ করছে লক্ষ করুন। এক জরিপ অনুযায়ী ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এদেশে খ্রিস্টানের সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ। আর ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তা দাঁড়িয়েছে ১ কোটিতে। বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখে পৌঁছেছে।
বাংলাদেশে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য আগত ড. উইলিয়াম কেরি, রিগর্ড হলওয়ে ও বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ড. আলসেনের মত লোকদের পদচারণায় বাংলাদেশের এন.জি.ও এবং খ্রিস্টান মিশনারীরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তারা বাংলা ভাষা রপ্ত করে 'ইতিহাস মালা', 'কথোপকথন' নামে বই রচনা করে তা খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের জন্য প্রচার করছে। তারা ক্রুশ ছুয়ে জীবনপণ ধর্মীয় প্রচারে ওয়াদাবদ্ধ হয়। এ কাজে তারা ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস ভুলে বিস্ময়কর কষ্ট ও ত্যাগ-তিতীক্ষা স্বীকার করে। তারা এদেশের ২০ লাখ আদিবাসী ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।
ড. ভিগাবি আলসেনের পরিচালনায় চার্চ অব বাংলাদেশ নামে একটি সংস্থা

কক্সবাজার মালুমঘাটে একটি মেমোরিয়াল হাসপাতাল পরিচালনা করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি গত ৩৮ বছর ধরে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের কাজে বিশ্বের বুকে ইতিহাস গড়েছে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে মালুমঘাটে একজন লোকও খ্রিস্টান ছিল না। কিন্তু ড. ভিগাবি আলসেনের দীর্ঘ সময়ের আমরণ প্রচেষ্টায় ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে সেখানে খ্রিস্টানের সংখ্যা ৪০ হাজারে উন্নীত হয়। যার ভিত্তিতে তারা পার্শ্ববর্তী এলাকার জমি ক্রয় করে এসব নব খ্রিস্টানদের পূনর্বাসন এলাকা তৈরি করছে। তারা চট্টগ্রামের দৌলতপুরে মরিয়ম আশ্রমের পাশেও বিশাল খ্রিস্টান আবাসিক এলাকা গড়ে তুলেছে।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বৃটেনের এক কনফারেন্সে তাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও পরিচালকবৃন্দ এদেশের ব্যাপারে তাদের অভিসন্ধি নির্ধারণ করে যে, প্রকৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি এ জন্য বৃটেনের কাছে সোপর্দ করেছে, যেন এতদঞ্চলের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মিশনারীদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। তাই আমাদেরকে এতদঞ্চলের লোকদের ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্ট রাজ্যে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। (সূত্র: তারীখে পাকিস্তান)

বর্তমানে হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও সিলেটে ৩০ হাজার খাসিয়া জনগোষ্ঠী বসবাস করে। তার মধ্যে ৯০ভাগ খাসিয়া জনগোষ্ঠী বর্তমানে খ্রিস্টানে পরিণত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের সীমান্তের ওপারে মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ইত্যাদি পাহাড়ী অঞ্চল রয়েছে, যার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী খ্রিস্টানে পরিণত হয়েছে। এখন সেখানে গড়ে উঠেছে সুদৃশ্য গীর্জা ও সুরম্য প্রাচীর। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সাজেক এলাকাসহ বিভিন্ন ইউনিয়নে তারা প্রায় ১০ হাজার উপজাতিকে ধর্মান্তরিত করেছে। শুধু তাই নয়, সেখানে মিশনারীরা হাসপাতাল, ক্লিনিক, বিনোদন কেন্দ্র, চার্চ প্রতিষ্ঠা করে নীরবে ধর্মান্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায় ইউরোপীয় দাতাগোষ্ঠীরা সুদূর প্রসারী কোন টার্গেট নিয়ে সামনে এগোচ্ছে। শুধু ইউ.এন.ডি.পি (UNDP) বৎসরে ২০ লাখ মার্কিন ডলার বাজেট করে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যয় করে যাচ্ছে। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী মি. টরবেন ভি পিটারসনের নেতৃত্বে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ হতে আর.ডি.আর.এস (RDRS) সংস্থা নীরবে বৃহত্তম দিনাজপুর ও রংপুর জেলার সীমান্ত অঞ্চলের আদিবাসী ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম প্রচারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি উপজাতি রাখাইন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মি. উসিথ মং বলেন, গত ৩৫ বছরে পটুয়াখালীতে প্রায় ৯০ শতাংশ রাখাইনকে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং তাদেরকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে।

বর্তমানে পাশ্চাত্য দুনিয়ার শ্যেন দৃষ্টি পড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর। পূর্ব তিমুরের পর তারা এই অঞ্চলকেও পৃথক খ্রিস্টরাজ্য বানাতে চায়। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্তির সময় দু'টি স্বাধীন দেশের পাশাপাশি আরো দু'টি স্বাধীন ভূখণ্ডের দাবিতে তারা সোচ্চার ছিল। একটি হল শিখদের খালিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী। অপরটি দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে খ্রিস্টানদের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী। সেই লক্ষ্য অর্জনে তারা আজ সাফল্যের সঙ্গে বহুদূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু আমরা আমাদের দায়িত্ব ভুলে গিয়েছি, যার মাশুল একদিন আমাদের দিতেই হবে। (সূত্র: পাক্ষিক দেশ জগত; ২০০৭ খ্রি.)

অর্থনৈতিক আগ্রাসনের বেড়াজাল

উন্নত অর্থনীতি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড। পুঁজিবাদীদের মূল শ্লোগান হল চাহিদা এবং যোগান। অর্থের পূর্ণ মালিকানা মালিকের। এতে অন্য কারও সামান্য অধিকারও নেই। এ অর্থব্যবস্থার উদ্যোক্তা হল ইয়াহুদী-খ্রিস্টান, যা আজ সারা দুনিয়ার অর্থব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অনেকেরই সঠিক ধারণা নেই। এ অর্থব্যবস্থার মারাত্মক দু'টি ক্ষতি হল, শুধু চাহিদা অনুযায়ী যোগান দিলে হালাল-হারামের কোন ভেদাভেদ থাকবে না। ব্যবসায়ীরা অন্ধের মত যে জিনিসের চাহিদা পাবে সে জিনিসই সাপ্লাই দেয়া শুরু করবে। উদাহরণত বিবেক-বুদ্ধি, মানবতা ও মনুষ্যত্ব বিনাশী মদ, গাঁজা, ফেনসিডিল, আফিম, বিয়ার, ইয়াবার চাহিদা বেশি থাকলে এগুলোরই যোগান দেয়া হবে। যদিও এগুলোর কারণে মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাক না কেন। দ্বিতীয় ক্ষতি পুরো সমাজে সুদের সয়লাব। সুদী লেনদেন ব্যাপক হলে ধনী ব্যক্তি রাতারাতি আরো ধনী আর অসহায় গরীব দিনের পর দিন আরো নিঃস্ব হয়ে যায়। কিন্তু শান্তির ধর্ম ইসলাম যে অর্থনীতি পেশ করেছে তার মধ্যে এ সব লাগামহীন বরবাদীর কোনটিই নেই।

বর্তমানে সারা দেশে শত শত সুদী ব্যাংক আছে। এগুলো টিকিয়ে রাখতে ব্যাংকিং ট্রেনিং সেন্টার, হিসাব শেখার কোর্স, সুদ কষার বই-পত্র স্কুল-কলেজ থেকে নিয়ে ইউনিভার্সিটি সব পর্যায়েই ব্যবস্থা আছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বব্যাপী সুদের কাজ নিয়মিত তদারকির জন্য খ্রিস্টানরা বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিতে সুদী মহাজনকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। সুদের প্রচার-প্রসারের জন্য তারা এদেশে ৫৫ হাজার এন.জি.ও কাজে লাগিয়ে রেখেছে, যারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে চড়া সুদে মানুষের নিকট সুদী ঋণ বিলাচ্ছে। এই প্রতারকেরা এতটুকুতেই ক্ষ্যান্ত নয়, এদেশের মুসলমানেরা যেহেতু সরাসরি 'সুদ' নাম শুনলে আল্লাহর ভয়ে আৎকে ওঠে, তাই তারা কৌশলে সুদের নামই পরিবর্তন করে দিয়েছে। ইন্টারেস্ট, বখশিশ, ইনআম, মুনাফা ইত্যাদি নামে সুদী টাকা হাজী গাজী নামাযীর ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। এমনকি সুদী ব্যাংকের গায়ে ইসলামী ব্যাংকিং এর সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে মুসলমানকে সুদে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হল, দুনিয়ার অধিকাংশ অভিজাত ব্যবসায়ী পণ্যের আবিষ্কারক ও মালিক হল ইয়াহুদী। তদ্রূপ ইউ.এস.এ -এর স্বীকৃত কসমেটিক্সসহ দামী দামী সব ওষুধ, রাসায়নিক অস্ত্র ও দ্রব্যের স্বত্বাধিকারীও মানবতার এই

দুশমনেরা। আফসোস! আখেরাত বর্জনের ফলে আল্লাহর লা'নতে আজ আখেরাতের পাশাপাশি দুনিয়াও আমাদের হাতছাড়া হয়েছে। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক ও মুফতী আল্লামা শফী রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ *তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন* -এ অত্যন্ত দুঃখ করে বলেন, হায়! মুসলমান আজ সারা বিশ্বে অমুসলিমদের কৃষ্টি-কালচার, খাওয়া-দাওয়া, পড়া-শোনা, পোশাক-আশাক, উঠা-বসা, চুল-দাড়ি সবকিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করে। কিন্তু অমুসলিমদের কর্তব্যপরায়ণতা, কর্ম-অনুরাগ, পরিশ্রম-প্রিয়তা এবং শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতি লাভের বিষয়গুলো অনুসরণ করে না। মুসলমানদের বৃহৎ শ্রেণী এমন রয়েছে যারা পরকালের কাজও করে না, দুনিয়ার কাজও করে না। যারা শুধু পরকাল নিয়ে ব্যস্ত তারা অবশ্যই সৌভাগ্যবান। কিন্তু যারা কোনটাই করল না তারা যদি অমুসলিমদের ন্যায় কর্মঠ হয়ে বৈধভাবে উন্নতির কাজ করত, তাহলে অবশ্যই দুনিয়ার উন্নতি মুসলমানের হাতে থাকত। কারণ দুনিয়ার প্রতিটি কাজের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। যেমন, চাষাবাদের দ্বারা ফসল হবে, কিন্তু ঘরের ফার্নিচার অর্জিত হবে না। ফার্নিচার ক্রয় বা তৈরির জন্য মিস্ত্রী বা মার্কেটের প্রয়োজন হবে। ক্ষেতে বসে তা হবে না। আবার মার্কেটে বসে ফসল পাওয়া যাবে না। তার জন্য ক্ষেতে বা কৃষকের নিকট যেতে হবে। ঠিক তদ্রূপ সারা দুনিয়ার মুসলমান যদি ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রযুক্তি, আবিষ্কার ও গবেষণা ছেড়ে মসজিদ-মাদরাসায় ইবাদাতে মশগুল থাকে তাহলে তা অবশ্যই ভালো। কিন্তু এর দ্বারা তাদের দুনিয়ার উন্নতি ও প্রযুক্তি হাতে আসবে না।

এই দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার সাথে কারো আত্মীয়তা নেই। ন্যায়-নিষ্ঠা, প্রচেষ্টা, কর্ম, গবেষণা, প্রযুক্তি, শিল্পোন্নতির অবিরাম মেহনত করলে চাই সে যে ধর্মেরই হোক তা তাকে দুনিয়াতে দান করা হবে। শুধু ধর্মের নামের কারণে দুনিয়াতে কোনদিন অভাব বা স্বচ্ছলতা আসে না। এমন মনে করা ভুল যে, মুসলমান হলেই ইসলামের নামের কারণে বিজয় অথবা ধন-সম্পদ আসবে। বরং তা অবশ্যই আসবে ঈমান আমলের মজবুতি ও কাজের ন্যায়-নিষ্ঠা ও আখলাকের দ্বারা। অলসতা দিয়ে কখনও নয়। আবার অমুসলিম হলেই ইয়াহুদী নামের কারণে পরাজয় বা দারিদ্র আসবে না। আসবে বদ আমল ও ন্যায়-নিষ্ঠা বর্জন ও কাজে অলসতার কারণে। অলসতা কোন ধর্মেই ইবাদত নয়। এমনকি ইসলামেও নয়। তাহলে প্রয়োজন মাফিক দীন-ধর্ম শিক্ষা যেমন ফরয তেমনিভাবে অর্থ-সম্পদ ও হালাল রুজি অন্বেষণও ফরয। তাহলে আজ সারা দুনিয়ার মুসলমান এ বাস্তব সত্যটুকু কিভাবে ভুলে গেল! (সূত্রঃ সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন; পৃষ্ঠা ৫৬, সূরা বাকারা-১১৩) অর্থনৈতিক আগ্রাসনের উপমা হিসেবে ইয়াহুদী-খ্রিস্টান কর্তৃক নির্মিত দু'টি প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকের কথা উল্লেখ করা যায়। গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান। ২০০৮ ইং পর্যন্ত এটি মানুষের মধ্যে ৭০৬ কোটি ডলার ঋণ প্রদান করেছে। ২০০৬ সন পর্যন্ত সারা দেশে তার শাখা ছিল ২১ হাজার। ঋণের উপর গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার ২০%। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের মধ্যে ৯৭ ভাগই হল মহিলা। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক ১২ হাজার কোটি ৪৩৫ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকার মালিক। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সুদের ভিত্তিতেই জমা হচ্ছে এবং বণ্টন হচ্ছে। (সূত্রঃ ওয়েব সাইট গ্রামীণ ফাউন্ডেশন ইন্টারনেট)

ব্র্যাক একটি অমুনাফাভোগী এন.জি.ও সংস্থা। ২০১২ সনের তথ্য অনুযায়ী তারা এ দেশের ৬৪ টি জেলায় কার্যক্রম ও অফিস চালু করে ব্যবসা নিয়মিত করেছে। তাদের কর্মীর সংখ্যা এক লক্ষ দুই হাজার দুইশত একাশি জন। যার মধ্যে ৭০% কর্মী মহিলা। ২০১১ সনে সংস্থাটির ব্যবসায়িক আয় হয়েছে ত্রিশ হাজার একাশি কোটি একষট্টি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আটশত আটচল্লিশ টাকা। বর্তমানে উক্ত সংস্থাটির পরিধি দেশ ছেড়ে বিদেশের ১৪টি দেশে তার শাখা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়েছে। ব্র্যাকের অন্যতম উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। যার ভিত্তিতে তারা সারা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের এক বিরাট অংশ দখল করে নিয়েছে। তাদের উল্লেখযোগ্য পণ্য হল- আড়ং দুধ, ঘি, দধি, তৈরি পোষাক, শাড়ী, থ্রি পিছ, জামা, পাঞ্জাবী, উন্নত মানের মার্কেট, শপিং মল। এছাড়া গার্মেন্ট, মিল-কারখানাও তাদের রয়েছে। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের ব্র্যাক ব্যাংক, বিকাশ, হাসপাতাল, ক্লিনিকসহ বহু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রয়েছে। তাদের আরেকটি লক্ষ্য হল শিক্ষা বিস্তার করা। সে লক্ষ্যে তারা এ দেশের মূল মূল পয়েন্টে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এমনকি বাংলাদেশের চার হাজার চারশত একান্নটি ইউনিয়নের প্রায় সবগুলোতে তাদের ব্র্যাক স্কুল রয়েছে। এছাড়াও ব্র্যাক সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখায় এ পর্যন্ত দেশে-বিদেশে পাঁচ বার জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত হয়েছে। (সূত্রঃ brac.net)

অমুসলিমদের দানে পরিচালিত আরেকটি সংস্থার নাম আশা। আশা মূলত ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে আশার সদস্য সংখ্যা ২০,২০,০০০ জন এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা মোট ৮০০০ জন। ২০০৭ সনের তথ্য অনুযায়ী বিখ্যাত ফোবর্স ম্যাগাজিনের জরিপে বিশ্বের সেরা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আশা প্রথম স্থান অধিকার করে। ঐ সময় গ্রামীণ ব্যাংকের অবস্থান ছিল ১৬তম। ২০০৯ সন পর্যন্ত আশা ৪০ লক্ষ গ্রাহকের মাঝে চৌদ্দ হাজার দুইশত একান্ন কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেছে। বাংলাদেশে তার ৩২৩৬টি শাখা রয়েছে। যারা নিরবচ্ছিন্নভাবে সুদ ও বেপর্দার সয়লাব দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। (সূত্রঃ ওয়েব সাইট)

এছাড়াও তাদের রয়েছে গ্রামীণ ফোনের বিশাল ব্যবসা। এ সকল ব্যবসায় তারা আমাদের দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশ নিয়ে যাচ্ছে। এই এক দুটি সংস্থাই

নয়, হাজার হাজার সংস্থা মুসলমানদের ধন-সম্পদ, ইজ্জত-আব্রু, ঈমান-আমল ধ্বংস করার জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে মুসলমানদেরও সজাগ থাকা দরকার এবং শত্রু থেকে হুশিয়ার হওয়া প্রয়োজন।

সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বিনষ্টের ধ্বংসাত্মক কারসাজি

প্রত্যেক জাতির আদর্শ-নমুনা, চিন্তা-চেতনা, সভ্যতা প্রকাশ পায় তাদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার মাধ্যমে। এক জাতি অন্য জাতির সংস্কৃতি গ্রহণ করার অর্থ হল সে নিজের জাতিসত্তা অন্যের কাছে বিকিয়ে দিল। এ জন্যই কেয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাতির সংস্কৃতি কী হবে তা নিরূপণ করে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.

অর্থ : তোমাদের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ। [উত্তম সংস্কৃতি, উত্তম নমুনা।] (সূরা আহযাব- ২১)

সংস্কৃতি শব্দটি সংস্কার থেকে নির্গত। যার অর্থ হল শুদ্ধায়ন, পবিত্র করণ, সংশোধন। পরিভাষায়, জীবনাচারের সংশোধিত পরিমার্জিত চলাফেরা, উঠা-বসা, আহার-বিহার, আনন্দ-আহ্লাদ ইত্যাদি অবস্থার বিকাশকে বলা হয় সংস্কৃতি। সুতরাং কোন জাতির সংস্কৃতি হল সে জাতির চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও অনুভূতির আলামত।

সংস্কৃতির তিনটি দিক রয়েছে। (এক) বিশ্বাসগত সংস্কৃতি, (দুই) ব্যবহারিক জীবনের সংস্কৃতি ও (তিন) মননগত সংস্কৃতি। আজ অমুসলিমরা আমাদের উক্ত সব ধরণের সংস্কৃতিকে নষ্ট করে দিয়েছে। আকীদা ও বিশ্বাসগত সংস্কৃতি নষ্ট করে দিয়েছে। পূজা, মাজারপূজা, দরগাহভক্তি, উরস শরীফ, ঈদে মীলাদুন্নবী, জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকীকে মুসলিম সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে রূপ দেয়ার প্রয়াস পেয়েছে। ব্যবহারিক জীবনে মুসলমান নিজ সংস্কৃতি বর্জন করে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের অক্টোপাসে আবদ্ধ। সীমানার ওপারের মঙ্গল-প্রদীপ থেকে নিয়ে পশ্চিমাদের এক মিনিটের বোবা (নীরবতা পালন) সংস্কৃতিও আমাদের মাঝে বিদ্যমান। বিকৃত যৌনাচার এখন আমাদের দুলাল-দুলালীদের বিবাহের পূর্বেই দুলহা-দুলহানে পরিণত করেছে। টিভি, সিনেমা, ইন্টারনেট, ব্লুফিল্মসহ বিনোদনের নামে মুসলিম জাতিসত্তা আজ কলুষিত।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সারা দুনিয়ার মানুষ বিশ্বকাপ খেলার শিরোনামে এমন কোন অশালীন কাজ নেই যা তারা করছে না। আজ বিশ্বকাপ মানে বিশ্বপাপ। মননগত সংস্কৃতির ধ্বংসলীলা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভালোবাসা, , সহিষ্ণুতা, বদান্যতা, বিনয় এগুলো পালনীয়। হিংসা, বিদ্বেষ, রাগ, আক্রোশ সব বর্জনীয়। কিন্তু আজ প্রেম-ভালোবাসার নামে কী জঘন্য বেহায়াপনা, নগ্নতা, অশ্লীলতা বৈধ করে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বর্ষবরণ, নবীন বরণ, সাংস্কৃতিক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান তো বেহায়াপনা আর জৈবিক ভোগ বিলাসিতারই অপর নাম। (সূত্র: ৩০সালা স্মারক, মালিবাগ)

এছাড়াও সামাজিকতা রক্ষা করতে আমরা এতটাই উদার যে, বলে ফেলি 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। মুসলমান হিন্দুকে পূঁজার আশীর্বাদ জানায় আর হিন্দু মুসলমানকে ঈদের শুভেচ্ছা জানায়। ফুল দিয়ে কবরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, কালো পোশাকে শোক পালন, একেক উৎসবে একেক পোশাক পরিধান ইত্যাদি সবই অপসংস্কৃতি, যা একান্ত বর্জনীয়। কিন্তু এগুলো মুসলমানদের নিত্যদিনের জীবনে কৌশলে ঢুকিয়ে দেয়াই দুশমনের কারসাজি।

পারিবারিক বন্ধন ও পর্দার বিধান লঙ্ঘনের প্রতারণা

বিদেশী কিছু কিছু এন.জি.ও'র মুখরোচক শ্লোগান হল, 'কিসের বর কিসের ঘর', 'ঘরের ভিতর থাকব না, স্বামীর কথা মানব না', 'আমার মন আমার দেহ, যাকে খুশি তাকে দেব', 'নিজের হাতে নিজের কামাই, অন্যের হাতের ভিক্ষা না খাই' ইত্যাদি জাতীয় উদ্ভট যৌন স্বাধীনতা উদ্দীপক শ্লোগান শিক্ষা দিয়ে আমাদের সরলমনা মা-বোনদেরকে স্বামীর নিরাপত্তা থেকে বের করে ভোগ্য পণ্যে পরিণত করছে। ফলে মুসলিম সমাজের পারিবারিক বন্ধনের ঐতিহ্য নষ্ট হওয়ার পথে। ঘুণ যেমন কাঠের ভেতরটা খেয়ে শুধু কাঠামোটা রেখে দেয় আজকের মুসলিম পরিবারগুলোও তেমন অন্তঃসার শুন্য হয়ে পড়েছে। ভাবতেও কষ্ট হয় যে, 'মুসলমানদের বিবাহ-শাদী মসজিদে হওয়া উত্তম' এ সাধারণ বিষয়েও মুসলমান ভাই-বোনেরা অজ্ঞ।

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের এজেন্ট এন.জি.ও-গুলো জনগণকে উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার নিমিত্তে কতগুলো কটুক্তিমূলক শ্লোগান শিখাচ্ছে। যেমন, 'জর্জ-ম্যাজিস্ট্রেট থাকে ঘরে, মোল্লা এখন বিচার করে'। তাছাড়া তারা গ্রামের গরীব সরলমনা মুসলমানের নিকট গিয়ে বলছে, মুসলমান মানেই দরিদ্র আর খ্রিস্টান মানেই ধনী। তারা মানুষকে ধর্ম বিমুখ করার জন্য শুক্রবারের জুম'আসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারে অনাসক্তি, অনাগ্রহ সৃষ্টি করেছে এবং বাহানা করে নামাযের সময় অফিসের কাজের চাপ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমনকি প্রাইভেট স্কুল ও কোচিং সেন্টারে জুম'আর নামাযের সময় ক্লাস করার ব্যবস্থা রেখেছে। এন.জি.ও-রা পর্দা ব্যবস্থার ঘোর বিরোধিতা করে। তারা বলে 'পর্দা অগ্রগতি ও প্রগতির অন্তরায়'। আবার কাউকে পর্দার ভুল ব্যাখ্যা দেয় যে, জান বাঁচানো ফরয। তাই চাকুরীর জন্য পর্দা লাগে না। বোরকা বা হাফ বোরকা পরে চাকুরী করলে বা পুরুষদের সঙ্গে একসাথে ডিউটি করলেও কোন অসুবিধা নেই ইত্যাদি। (দৈনিক ইনকিলাব)

বর্তমানে খ্রিস্টানরা নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাবলম্বী ও নারী অধিকারের নামে মুসলিম পরিবার নীতির গোড়ায় কুঠারাঘাত করেছে। তারা সমাজের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থান না করে অতি উৎসাহী হয়ে ৭০% বা ৯০% নারীদেরকে চাকুরীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ সকল চক্রান্ত দ্বারা উদ্দেশ্য মুসলমান দেশগুলোকে নেতৃত্ব শূন্য করে দেয়া এবং মুসলিম সমাজে কোন বুযুর্গ আল্লাহ ওয়ালা তৈরি হতে না দেয়া। যার পরিণতি হল পাশ্চাত্যের নিঃশর্ত গোলামী। (সূত্রঃ সেবার নামে এন.জি.ওদের ষড়যন্ত্র)

(বাকী অংশ আগামী সংখ্যায়)

লেখক: শিক্ষক, মদীনাতুল উলূম মাদরাসা, শিকদার মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

স·ম·সা·ম·য়ি·ক প্রসঙ্গ

কুরবানীর তাৎপর্য : ফাযায়েল ও মাসায়েল

মা'হাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া ঢাকা

কুরবানীর অর্থ

'কুরবান' এটি আরবী ভাষার মূলক্রিয়া। অর্থ সান্নিধ্য হওয়া, ঘনিষ্ট হওয়া। শব্দটি আরবী ভাষায় বিশেষ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। তখন এর অর্থ হয়, এমন বিষয় যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়, রাষ্ট্রপ্রধানের সহচর, বিশেষ লোক। আরবী 'কুরবান' শব্দের অন্তে 'ইয়া' বর্ণ যুক্ত হয়ে সম্বন্ধ বিশেষণ হয়ে 'কুরবানী' হয়েছে। অর্থ জবাই, ঈদুল আযহার পশু, আল্লাহর রাস্তায় জবাইকৃত হালাল পশু। হযরত আদম আ. এর দু'পুত্রের ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা 'কুরবান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ

অর্থ : তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শোনান। যখন তারা উভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি। সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে বলল, আল্লাহ্ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন।(সূরা মাইদা- ২৭)

তবে কুরআন-হাদীসে কুরবানী বুঝানোর জন্য اضحية (উযহিয়্যাহ) এবং 'নুসুক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'নুসুক' শব্দটির অর্থ হল, ইবাদত করা, আনুগত্য করা, প্রত্যেক ঐ বস্তু যার মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জিত হয়। (লিসানুল আরব ১০/৪৯৮, আততাহবীর ওয়াততানবীর; পৃষ্ঠা ৩৫২)

সূরা আন'আমের ১৬২ নং আয়াতে কুরবানী অর্থে নুসুক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কুরবানীর যে দু'আটি আমরা পাঠ করে থাকি তাতেও 'নুসুক' শব্দটি রয়েছে।

শরিয়তের পরিভাষায় কুরবানী বলা হয় ঈদুল আজহার দিনগুলোতে নির্দিষ্ট প্রকারের গৃহপালিত পশু আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য জবেহ করা।

কুরবানীর তাৎপর্য

কুরবানী একটি মহান ইবাদত। বিসর্জনের মহিমাস্নাত শর্তহীন আনুগত্য। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাসিলের সর্বকালীন আয়োজন। হযরত আদম আ. এর যুগ থেকেই কুরবানী বিদ্যমান। তবে সকল নবী আ. এর শরীয়তে কুরবানী পদ্ধতি অভিন্ন ছিল না। ইসলামী শরীয়তে হযরত ইবরাহীম আ. এর কুরবানীপদ্ধতি অনুসৃত। পিতা পুত্রের অকুণ্ঠ সমর্পণের দীপ্ত স্মারক আমাদের এই কুরবানী। হযরত ইবরাহীম আ. যেমন আল্লাহ তা'আলার আদেশ পেয়ে তাঁর সন্তুষ্টির আশায় আপন কলিজার টুকরো সন্তানের গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন। কি অন্যায় করেছি আমি? কি অপরাধ করেছে আমার নিষ্পাপ শিশুটি? এ জাতীয় কোন প্রশ্ন খলীলুল্লাহর হৃদয়ে ঠাঁই পায়নি। শিশু ইসমাঈল আ. যেভাবে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে শাণিত ছুরির নিচে শির সঁপে দিতে কোন দ্বিধা করেননি। নিঃশঙ্ক চিত্তে ঘোষণা করেছেন, হে প্রিয় পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা পালন করুন, ইনশাআল্লাহ আমাকে সবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন। (সূরা সাফফাত- ১০২)

ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় কুরবানী করার মাধ্যমে শর্তহীন আনুগত্য পেশ করাই কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য। নির্দিষ্ট দিনগুলোতে নির্দিষ্ট পশু যবেহ করার মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ পালন করে তাঁর মহব্বতের নজরানা পেশ করাই কুরবানীর তাৎপর্য। তিনি আদেশ করেছেন তাঁর নামে কুরবানী করতে, ব্যস্ আমরা তাঁকে খুশি করার জন্য কুরবানী করবো। নিরাপরাধ পশুগুলোকে হত্যা করে কি লাভ? কোটি কোটি টাকার পশু হত্যা না করে এ টাকাগুলো জনকল্যাণে ব্যয় করলেই ভালো হত ইত্যাদী ঈমান বিরোধী ভাবনা যেন আমাদেরকে স্পর্শ না করে। কুরবানী করলে গোশতের প্রয়োজন পূরণ হবে, আমার পরিবার গোশত খেতে পারবে ইত্যাদি স্বার্থচিন্তা যেন আমাদের মাথায় না আসে। সৃষ্টির বাহবা কুড়ানো বা প্রতিবেশীর ঈর্ষাকাতর দৃষ্টির সুখটুকু লাভ করা কিংবা পত্রিকার শিরোনাম হওয়ার লক্ষ্যে দামি পশু ক্রয় করার মানসিকতা যেন আমাদের হৃদয়ে ঠাঁই না পায়। 'পশু নয় পশুত্বের কুরবানী চাই', 'অবোধ পশুকে নয় মনের পশুকে করো জবাই' ইত্যকার শব্দচাতুর্যে কুরআন বিরোধী শ্লোগান যেন আমাদের অন্তরে এই 'ইবাদাতে মাকসূদা' (কুরবানী) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করতে না পারে।

মহান রব্বুল আলামীন আমাদেরকে পশু কুরবানী করতে আদেশ করেছেন, আবার সেই পশুর গোশত কুরবানী দাতার জন্য হালাল করেছেন, এমনকি যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ থেকে মোট চার দিন রোজা রাখা নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তা'আলার মেহমানদারী কবুল করার নির্দেশ দিয়েছেন, এটা আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার অপার মেহেরবানী। পশুত্বের কুরবানী কিংবা মনের পশুকে জবাই করার মাধ্যমে কি এতগুলো নির্দেশ পালন হয়ে যাবে?। এর বিপরীতে সকল স্বার্থচিন্তা ও বস্তুবাদী ভাবনা ঝেড়ে ফেলে ইখলাসের সাথে কুরবানী করলে পশুর সাথে সাথে ইনশা-আল্লাহ পশুত্বের কুরবানীও হয়ে যাবে।

কুরআনের আলোকে কুরবানী

ইসলামি শরীয়তে এটি এবাদত হিসেবে সিদ্ধ, যা কুরআন, হাদিস ও মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন মজীদে যেমন এসেছে,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.

তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে নামায আদায় কর ও পশু কুরবানী কর। (সূরা কাউসার- ২)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.

অর্থ : বল, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম। (সূরা আনআম- ১৬২, ১৬৩)

এছাড়াও মৌলিকভাবে কুরবানীর বিধান সূরা ২৭, ৩৭ নং আয়াত, সূরা বাকারা ১৯৬ নং আয়াত এবং সূরা সফসহ বিভিন্ন সূরায় রয়েছে।

কুরবানীর ফযীলত

ক. কুরবানী দাতা সাইয়িদুনা হযরত ইবরাহিম আ. ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ বাস্তবায়ন করে থাকেন।

খ. পশুর রক্ত প্রবাহিত করার মাধ্যমে কুরবানী দাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নৈকট্য অর্জন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

অর্থ : আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদের পথ-প্রদর্শন করেছেন; সুতরাং আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণ-দেরকে। (সূরা হজ্জ- ৩৭)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা রাযি. কে তার কুরবানীর নিকট উপস্থিত থাকতে বলেন এবং ইরশাদ করেন, এই কুরবানীর প্রথম রক্তবিন্দু প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তোমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি শুধু আহলে বাইতের জন্য, না কি সকল মুসলিমের জন্য? তিনি উত্তরে বললেন, এই ফযীলত সকল মুসলিমের জন্য। (মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ৭৫২৫, আততারগীব ওয়াততারহীব ২/১৬৪)

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুরবানীর দিন আদম সন্তান যত কর্ম করে তন্মধ্যে আল্লাহর নিকট প্রিয়তম কর্ম হল, রক্ত প্রবাহিত করা। কুরবানীর পশু কিয়ামতের দিনে তার শিং, খুর ও পশমসহ উপস্থিত হবে। আর কুরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর নিকট মর্যাদার স্থানে স্থিত হয়। সুতরাং তোমরা আনন্দ চিত্তে কুরবানী প্রদান কর। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৪৯৩)

কুরবানীর বিধান

কুরবানী করা ওয়াজিব। ইমাম আওযায়ী, ইমাম লাইস, ইমাম আবু হানীফা ইমাম মালেক ইমাম আহমদ ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. প্রমুখের মত এটাই। (কিতাবুল আসার ২/৭৫৯, মুহাম্মদ বিন উসাইমিন কৃত আহকামুল উযহিয়্যা; পৃষ্ঠা ২৬)

আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

অর্থ : তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর ও পশু কুরবানী কর। (সূরা কাউসার- ২)

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من وجد سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا.

অর্থ : যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহের ধারে না আসে। (মুসনাদে আহমদ; হা.নং ৮২৫৬)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يا أيها الناس: إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية.

অর্থ : হে মানব সকল! প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্ব হলো প্রতিবছর কুরবানী দেয়া। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩১২৫)

এই আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানী করা ওয়াজিব।

কুরবানী যাদের উপর ওয়াজিব

যার উপর সদকা ফিতর (ফিতরা) আদায় করা ওয়াজিব, তার উপর কুরবানী করাও ওয়াজিব। অর্থাৎ কুরবানীর তিন দিনের মধ্যে (১০ যিলহজ্জ ফজর থেকে ১২ই যিলহজ্জ সন্ধ্যা পর্যন্ত) যদি কোন মুসলমান আকেল, বালেগ ও মুকীম ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি ও আসবাবপত্রের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য, কিংবা সমমূল্যের টাকা বা যে কোনো সম্পদ থাকে, তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব। কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য এ মাল-সম্পদ এক বৎসর কাল স্থায়ী হওয়া শর্ত নয়। এ পরিমাণ মাল-ধন কুরবানীর দিনসমূহে থাকলেই কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, তারা যদি (সঙ্গতি থাকলে) কুরবানী করে, তারাও অনেক সওয়াবের অধিকারী হবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩১২৩, আদ্দুররুল মুখতার ২/২৩১, ৯/৪৫৭, হিদায়া ১/২৩২)

কুরবানীর পশু

গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা কুরবানী করা যায়। ছাগল, ভেড়া, দুম্বা এক বছরের। গরু, মহিষ দুই বছরের এবং উট পাঁচ বছরের হওয়া উচিত। কিন্তু ভেড়া ও দুম্বা যদি এমন হৃষ্ট পুষ্ট হয় যে, ছয় মাসেরটা দেখতে এক বছরের দেখায়, তবে এতেও কুরবানী হয়ে যাবে। (সূরা হজ্জ- ৩৪, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫১৯৪, ৫১৯৭, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৪৯৯, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৯৭, ফাতাওয়া শামী ৯/৪৬৫-৪৬৬)

মাসআলা: কুরবানীর পশু মোটা-তাজা, হৃষ্ট-পুষ্ট, সুদর্শন ও দোষমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। খাসীকৃত পশুর কুরবানী উত্তম। ভেড়া থেকে দুম্বা কুরবানী উত্তম। খাসী থেকে বকরীর কুরবানী উত্তম। এরূপ উট থেকে উটনী এবং ষাঁড় থেকে গাভী কুরবানী উত্তম। (মুসনাদে আহমদ; হা.নং ৯৭৩৯, ২৩৯১১, আদ্দুররুল মুখতার ৯/৪৬৬-৪৬৭)

মাসআলা: কুরবানীর পশু গর্ভবতী বলে জানা গেলেও তার দ্বারা কুরবানী জায়েয। তবে গর্ভে বাচ্চা জীবিত পেলে সেটাকেও আল্লাহর নামে যবেহ করে দিতে হবে এবং শরীকী কুরবানী হলে এটাকেও প্রত্যেকের অংশ হিসেবে পৃথক ভাগ করে দিতে হবে। কেউ ইচ্ছা করলে এর গোশত খেতে

পারে। কিন্তু না খেলে কোন দোষ হবে না। (ফাতাওয়া শামী ৯/৫৩৪, আযীযুল ফাতাওয়া ২/১৮২; ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৮৯)

মাসআলা: যদি বড় জানোয়ারের মধ্যে কারো অংশ সাত ভাগের এক ভাগের চেয়ে কম হয়, তাহলে একজনেরও কুরবানী আদায় হবে না। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৩১৮, আদ্দুররুল মুখতার ৯/৪৫৭)

মাসআলা: বকরী যতই মোটা তাজা হোক না কেন, তার জন্য এক বছর পূর্ণ হওয়া জরুরী। এক বছরের একদিন কম হলে কুরবানী জায়েয হবে না। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫১৯৪, রদ্দুল মুহতার ৯/৪৬৬)

মাসআলা: খরিদকৃত কুরবানীর জানোয়ার দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া মাকরূহ। চাই সে ধনী হোক বা গরীব হোক। সুতরাং কুরবানীর জন্য জানোয়ার ক্রয় করার পর যদি বাচ্চা হয় অথবা যবেহ করার পর যদি পেটে জীবিত বাচ্চা পাওয়া যায় তবে ঐ বাচ্চাটিও কুরবানী করে দিতে হবে। তবে বাচ্চা কুরবানী না করে জীবিত দান করে দেয়া জায়েয আছে। এমনিভাবে কুরবানীর নিয়তে খরিদকৃত জানোয়ারের দুধও নিজে পান করবে না। গরীবদের মধ্যে দান করে দিবে। (মুসনাদে আহমদ; হা.নং ১৬২৫৫, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩০০-৩০১, ফাতাওয়া শামী ৯/৪৬৭)

মাসআলা: কুরবানীর পশু হারিয়ে যাওয়ার পর আরেকটি ক্রয় করা হলো। অতঃপর হারিয়ে যাওয়া পশুটি পুনরায় পাওয়া গেল। তাহলে ধনাঢ্য ব্যক্তির জন্য দু'টির যে কোন একটি কুরবানী করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি যদি গরীব হয়, তাহলে তার উপর দু'টি পশুই কুরবানী করা ওয়াজিব। উল্লেখ্য, ধনী ব্যক্তি যদি প্রথমে ক্রয়কৃত পশুটি কুরবানী না করে দ্বিতীয়টি করে এবং প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টির ক্রয় মূল্য কম হয়, তাহলে প্রথমটি ক্রয় করতে দ্বিতীয়টির চেয়ে যে পরিমাণ টাকা অতিরিক্ত লেগেছে, সে পরিমাণ টাকা সদকা করতে হবে। (সুনানে বাইহাকী কুবরা; হা.নং ১৯৬৭১, ফাতাওয়া শামী ৯/৪৭১)

যে সমস্ত ত্রুটিযুক্ত পশু কুরবানী করা জায়েয নয়

ক. অন্ধ, কানা বা খোঁড়া জানোয়ার কুরবানী করা দুরস্ত নয়। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৪৯৭, ১৫০৩, সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২৮০৪, ফাতাওয়া শামী ৫/৩১৬, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৯৭)

খ. পশু যদি এমন রুগ্ন ও দুর্বল হয় যে, কুরবানীর স্থান পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে পারে না, তাহলে এমন জানোয়ারের কুরবানী জায়েয হবে না। (সুনানে নাসাঈ; হা.নং ৭২১৫, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৫০৩, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৯৭)

গ. জন্তুর কান বা লেজ এক তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে বেশি কেটে গিয়ে থাকলে, তার দ্বারা কুরবানী দুরস্ত নয়। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৪৯৮, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৯৮)

ঘ. যে পশুর মোটেও দাঁত নেই, কিংবা অধিকাংশ দাঁত পড়ে গেছে, তার দ্বারা কুরবানী করা যাবে না। যদি অধিকাংশ দাঁত বিদ্যমান থাকে, তাহলে কুরবানী জায়েয হবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৯৮)

ঙ. যে পশুর শিং উঠেইনি, কিংবা উঠেছিল কিন্তু উপর থেকে ভেঙ্গে গেছে, তার কুরবানী জায়েয। কিন্তু একেবারে মূল থেকে ভেঙে গিয়ে থাকলে, কুরবানী দুরস্ত নয়। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৫০৪, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৯৭)

চ. যে জানোয়ারের খুঁজলি বা চর্মরোগ হয়েছে, যদি এর প্রতিক্রিয়া গোশত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে থাকে, তবে কুরবানী দুরস্ত নয়, অন্যথায় দুরস্ত আছে। (আহকামে কুরবানী; পৃষ্ঠা ৩৬)

ছ. যে মাদী জানোয়ারের স্তন নেই, কিংবা স্তন আছে কিন্তু শুকিয়ে গেছে অথবা শক্তি বৃদ্ধির জন্য ঔষধের মাধ্যমে শুকিয়ে ফেলা হয়েছে, তাহলে এরূপ পশু দ্বারা কুরবানী দুরস্ত হবে না। (কিফায়াতুল মুফতী ৮/১৮৯, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৯৮)

কুরবানী করার নিয়ম

কুরবানীর জন্তুকে ক্বিবলা রোখ করে শোয়ানোর পর প্রথমে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বে। উল্লেখ্য, ক্বিবলার দিকে না করা হলে মাকরূহ হবে। (রদ্দুল মুহতার ৯/৪২৭)

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهم منك ولك بسم الله الله اكبر.

যবেহের পরে বলবে- اللهم تقبل منى كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك ابراهيم عليهم السلام (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২৭৯৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৪৮, ৩৪৯)

[যদি নিজের কুরবানী হয়, তবে মিন্নী বলবে। আর যদি অন্যের কুরবানী হয়, তবে মিন শব্দের পর যার বা যাদের কুরবানী তার বা তাদের নাম উল্লেখ করবে। আর যদি অন্যের সঙ্গে শরীক হয়, তবে মিন্নীও বলবে এবং মিন্নী-এর পর ওয়ামিন শব্দ লাগিয়ে তারপর অন্যদের নাম উল্লেখ করবে।]

অর্থ: আমি একমুখী হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ঐ আল্লাহর দিকে করেছি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকও নই। আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। হে আল্লাহ! এটাকে আপনি আমার পক্ষ হতে কবুল করে নিন। যেমন আপনি কবুল করেছেন আপনার হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আপনার খলীল হযরত ইবরাহীম আ. এর পক্ষ হতে। দু'আ নিজ ভাষায়ও পড়া যাবে।

মাসআলা: কুরবানী করার সময় মুখে নিয়ত করা এবং দু'আ পড়া জরুরী নয়। যদি অন্তরে এ ধারণা করে যে, আমি কুরবানী করছি, আর মুখে কিছুই না বলে শুধু 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করে তবুও কুরবানী জায়েয হবে। তবে যদি সহীহ শুদ্ধভাবে দু'আ স্মরণ থাকে তাহলে পড়ে নেয়া উত্তম। (ফাতাওয়া শামী ৯/৪৫২, জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৪৫০)

মাসআলা: যে কোনো হালাল পশুপাখি যবেহ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দিলে, যবেহকৃত প্রাণীর গোশত হারাম হয়ে যায়। তা নিজে খাওয়া বা অপরকে খাওয়ানো অথবা বিক্রি করা সম্পূর্ণ নাজায়েয বা হারাম। (সূরা মায়েদা- ৩, সহীহ বুখারী; হা.নং

৩৮২৬, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৮৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/১৪০)

মাসআলা: অনেক লোক কুরবানী করার জন্য দু'আ পড়াকে খুবই জরুরী মনে করে। অথচ দু'আ পড়া ব্যতীতই কুরবানী সহীহ হয়ে যায়। দু'আ পড়া শুধু মুস্তাহাব, জরুরী নয়। (আগলাতুল আওয়াম; পৃষ্ঠা ১৩৪)

মাসআলা: যবেহকারীর সাথে অন্য কেউ ছুরি চালানোর মধ্যে শরীক থাকলে তার জন্যও 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলা ওয়াজিব। যারা হাত, পা, মুখ ইত্যাদি ধরে তারা যবেহের মধ্যে শরীক নয়; বরং তারা শুধু সাহায্যকারী। কাজেই তাদের জন্য বিসমিল্লাহ পড়া জরুরী নয়। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৫০৭, ফাতাওয়া শামী ৯/৪৮৩)

মাসআলা: যবেহ করার সময় যদি পশুর মাথা শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে হারাম হবে না, হালালই থাকবে এবং কুরবানীও হবে। তবে মাকরূহ হবে। (রদ্দুল মুহতার ৯/৪২৭)

মাসআলা: যবেহের পর পশু শান্ত হওয়ার পূর্বে তার পায়ের রগ ইত্যাদি কাটা মাকরূহ। (রদ্দুল মুহতার ৯/৪২৭)

কুরবানীর ওয়াক্ত বা সময়

কুরবানী নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি ইবাদত। এ সময়ের পূর্বে যেমন কুরবানী আদায় হবে না তেমনি পরে করলেও আদায় হবে না। কারণ কুরবানীর কোনো কাযা নেই। তবে কারো উপরে যদি কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে এবং সে কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানী না করে তবে পরবর্তীতে তাকে একটি বকরীর মূল্য দান করে দিতে হবে। (আলমাবসুত লিসসারাখসী ৬/২০০৯, আলহিদায়া ৪/৪৪৪।)

যারা ঈদের নামায আদায় করবেন তাদের জন্য কুরবানীর সময় শুরু হবে ঈদের নামায আদায় করার পর থেকে। যদি ঈদের নামায আদায়ের পূর্বে কুরবানীর পশু জবেহ করা হয় তাহলে কুরবানী আদায় হবে না। হাদীসে এসেছে, আল-বারা ইবনে আযেব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবাতে বলেছেন,

إن أول ما نبدأ فى يومنا هذا، أن نصلى ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلوة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء.

অর্থ : এ দিনটি আমরা শুরু করব নামায দিয়ে। অতঃপর নামায থেকে ফিরে আমরা কুরবানী করব। যে এমন আমল করবে সে আমাদের আদর্শ সঠিকভাবে অনুসরণ করল। আর যে এর পূর্বে জবেহ করল সে তার পরিবারবর্গের জন্য গোশতের ব্যবস্থা করল। কুরবানীর কিছু আদায় হলো না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৯৬৫)

নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে কুরবানী পশু যবেহ করবে না; বরং নামাযের খুতবা দু'টি শেষ হওয়ার পর যবেহ করবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা শেষ করে যবেহ করেছেন। হাদীসে এসেছে, জুনদাব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী রাযি. বলেছেন,

صلى النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب ثم ذبح ...

অর্থ : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন নামায আদায় করলেন অতঃপর খুতবা দিলেন তারপর পশু জবেহ করলেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৯৮৫)

মাসআলা: যে শহরে একাধিক জায়গায় ঈদের নামায হয়, তথায় কোনো এক জায়গায় নামায হয়ে গেলেই কুরবানী জায়েয হবে। যিনি কুরবানী করবেন তিনি যদিও ঈদের নামায না পড়ে থাকেন, তারপরও এলাকার কোন মসজিদে ঈদের নামায হয়ে গেলেই কুরবানী করতে পারবেন। কেননা যার কুরবানী করা হবে, তার জন্য ঈদের নামায থেকে ফারিগ হওয়া জরুরী নয়। (ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৪৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৫৯৭)

মাসআলা: যে সমস্ত এলাকায় শরীয়ত মতে ঈদের নামায হয় না, সে স্থানের লোকেরা সুবহে সাদিকের পর কুরবানী করতে পারে। যদি শহরের লোকেরা এরূপ গ্রামে কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দেয়, তাহলে সেই পশুর কুরবানী সুবহে সাদিকের পর জায়েয আছে। তবে শহরবাসীদের নিজস্ব এলাকায় ঈদের নামাযের পর কুরবানী করতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ৯/৪৬১)।

মাসআলা: রাত্রেও কুরবানী করা যায় তবে ভালো নয়। কেননা হয়ত এর ফলে কোন রগ কাটা বাকী থাকতে পারে, যদ্দরুণ কুরবানীই বাতিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৯৬)।

মাসআলা: যদি বিশেষ কারণ বশতঃ কোনো এলাকার লোকজন প্রথম দিন ঈদের নামায পড়তে না পারে, তবে ঈদের নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পরই কুরবানী করা জায়েয হবে। (মাসায়িলে ঈদাইন ও কুরবানী; পৃষ্ঠা ১৫৮)।

মাসআলা: কুরবানী কেবলমাত্র তিন দিনের মধ্যে সীমিত। আর কুরবানীর দিনগুলো হলো **১০, ১১ ও ১২** যিলহজ্জ। এ তিন দিনের যে কোন দিন কুরবানী করা যায়। তবে প্রথম দিন কুরবানী করা উত্তম। তারপর পর্যায়ক্রমে **১১ ও ১২** যিলহজ্জ। উল্লেখ্য যে, কোন কারণ ব্যতীত কুরবানী করায় বিলম্ব না করাই উত্তম। (ফাতাওয়া শামী ৯/৪৮৫, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৯৫, সহীহ বুখারী; হা.নং ৯৫৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৯৬১)

অংশীদারিত্বের কুরবানী

শরীকী কুরবানী বা অংশীদারিত্বের কুরবানী হলে শরীকদের প্রত্যেকেরই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত থাকতে হবে। কেউ যদি কেবল গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরবানী করে, তাহলে কারো কুরবানীই দুরস্ত হবে না। (ফাতাওয়া শামী ৯/৪৭২)

মাসআলা: অংশীদারিত্বের কুরবানীর গোশত অনুমানের ভিত্তিতে বণ্টন করা যাবে না। বরং পূর্ণ মাত্রায় সতর্কতার সাথে সঠিক ও সমভাবে নিক্তিতে ওজন করে বণ্টন করা না হলে কোন অংশে যদি বেশ-কম হয়ে যায়, তাহলে তা সুদে পরিণত হবে এবং গুনাহ হবে। তবে কথা হলো, গোশতের সাথে যদি পশুর মাথা, পা, চামড়া ইত্যাদি সব এক সাথে বণ্টন করা হয়, তাহলে যে অংশে এগুলো পড়বে, সে অংশে গোশত কিছু কম পড়লেও জায়েয হবে। চাই যে পরিমাণ কম পড়ুক। আর যে অংশে

গোশত বেশি পড়েছিল, সে অংশে এগুলো দিলে সুদ গণ্য হবে এবং গুনাহ হবে। (ফাতাওয়া শামী ৯/৪৭২-৪৭৩)

মাসআলাঃ মনে করুন, সাত জন শরীক মিলে কুরবানী করার জন্য একটা পশু ক্রয় করেছে। কিন্তু পশু যবেহ করার পূর্বে এমন একজন অংশীদার পৃথক হয়ে গেল যার উপর কুরবানী ওয়াজিব এবং অন্য লোক যদি তার স্থানে শরীক হয়ে যায়, তবে তাদের কুরবানী শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি অংশীদারদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তি যবেহের পূর্বে পৃথক হয়ে যায়, যার উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল না, তাহলে অংশীদারদের কারো কুরবানী দুরস্ত হবে না। (আদ্দুররুল মুখতার ৬/৬৩৯, কিফায়াতুল মুফতী ৮/১৯২)

মাসআলাঃ স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর কুরবানী করা এবং স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। (আলমাবসূত লিস্সারাখসী ৬/২০০৯, ফাতাওয়া শামী ৯/৪৫৩)

হ্যাঁ, যদি অনুমতি নিয়ে একে অপরের কুরবানী করে তাহলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৬/১৯৫, ফাতাওয়া শামী ৯/৪৫৩)

মাসআলাঃ কোনো কোনো স্থানে মানুষ এক বছর নিজের নামে এক বছর ছেলের নামে আর এক বছর নিজের স্ত্রীর নামে কুরবানী করে অর্থাৎ প্রতি বছর নাম পরিবর্তন করতে থাকে এটা জায়েয নয়। বরং যার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়, প্রতি বছর শুধু তারই কুরবানী করা কর্তব্য। অন্যের নামে করলে তার নিজের কুরবানী আদায় হবে না। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৩)

মাসআলাঃ কুরবানী দাতার জন্য কুরবানীর গোশত বিক্রি করা হারাম। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ বিক্রি করে দেয় তাহলে সেই মূল্য গরীব মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। ঐ মালিক কোনো মতেই সেই মূল্য ভক্ষণ করতে পারবে না। তবে কোনো ব্যক্তি উক্ত কুরবানীর গোশতের মালিক হওয়ার পর সে যদি তা বিক্রি করে দেয় তাহলে তা নাজায়েয হবে না। গরু, মহিষ, উট ইত্যাদির মধ্যে সাত ভাগের বেশি শরীক হয়ে কুরবানী করা জায়েয হবে না। যদি কেউ এমন করে তাহলে তাদের মধ্যে কারো কুরবানী সহীহ হবে না। এমনকি কারো ভাগের মধ্যে যদি অন্য কাউকে শরীক করে তাহলেও জায়েয হবে না। দুই বা ততধিক ব্যক্তি সাত ভাগের এক অংশের মধ্যে শরীক হলেও কুরবানী জায়েয হবে না। (মুসনাদে আহমদ; হা.নং ১৬২৫৫, জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৪৫২)

মাসআলাঃ যদি কোন ব্যক্তির দশজন ছেলে থাকে এবং সকলেই একান্নভুক্ত হয়, তাহলে শুধু পিতার উপর একটি কুরবানী ওয়াজিব হবে। হ্যাঁ, যদি ছেলেরা নিসাবের মালিক হয়, তাহলে পিতার কুরবানী তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। তাদের আলাদা কুরবানী করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ৫/২০০)

মান্নতের কুরবানী

মাসআলাঃ কুরবানী মান্নত করলে, মান্নতকারী ধনী হোক বা গরীব হোক, সর্বাবস্থায় তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়। (সূরা হজ্জ- ৩০, সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৬৯৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯১, বাদায়িউস সানায়ি' ৫/৬১)

মাসআলাঃ মান্নতের কুরবানীর গোশত মান্নতকারী ও ধনী ব্যক্তিদের জন্য খাওয়া নাজায়েয। খেয়ে ফেললে, যে পরিমাণ খেয়েছে, তার মূল্য সদকা করে দিতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩২১)

মাসআলাঃ কোন নির্দিষ্ট জন্তুকে কুরবানী করার জন্য মান্নত করলে সেটাকেই কুরবানী করতে হবে। যদি কুরবানীর দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু জন্তুকে কুরবানী করা হয়নি, এমতাবস্থায় ঐ জন্তুটিকে জীবিত সদকা করে দিতে হবে। (ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৫৪, রদ্দুল মুহতার ৫/২০৪)

মাসআলাঃ নিসাবের মালিক ব্যক্তি যদি বকরা ঈদের পূর্বে কুরবানী করার মান্নত করে, তাহলে তার উপর দু'টি কুরবানী করা ওয়াজিব। একটি নযর বা মান্নতের দ্বিতীয়টি নিসাবের। (ফাতাওয়া শামী ৫/২২৫)

যবেহের মাসায়িল

মাসআলাঃ যবেহ করার সময় যবেহকারীর মুখ পশ্চিম দিকে করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। বিনা ওযরে অন্য দিকে মুখ করে যবেহ করা মাকরূহে তাহরীমী। (ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৮৮)

মাসআলাঃ নিজের কুরবানীর পশু নিজের হাতে যবেহ করা উত্তম। নিজে না জানলে, অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিবে। তবে যবেহের পশুর নিকট উপস্থিত থাকা উত্তম। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৫২১, মুস্তাদরাকে হাকেম; হা.নং ৭৫২৫, ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৮)

মাসআলাঃ যবেহ করার পর পশু একবারে নিস্তেজ হবার পূর্বে তার গলায় ছুরির মাথা দিয়ে আঘাত করা, পায়ের চামড়া কাটা বা চামড়া ছাড়ানো মাকরূহে তাহরীমী। (বাদায়িউস সানায়ি' ৫/৮০)

মাসআলাঃ কুরবানীর পশুর রশিসহ কোন কিছু বিক্রি করা যাবে না, পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া যাবে না। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৮; ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩০০)

চামড়ার মাসায়িল

মাসআলাঃ কুরবানীর চামড়া দীনী মাদরাসার দরিদ্র ছাত্রদেরকে দান করা উত্তম। কেননা তাতে দুই দিকে সাওয়াব অর্জন হয়। প্রথমতঃ গরীবকে দান করার সাওয়াব। দ্বিতীয়তঃ দীনী ইলমের প্রচার ও প্রসার। অর্থাৎ দীনের খিদমতের সাওয়াব। কিন্তু তা দ্বারা শিক্ষকের বেতন বা অন্য কর্মচারীর পারিশ্রমিক দেয়া আদৌ জায়েয হবে না। (জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৪৫৬, সূরা মায়িদা- ২, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৫৩৩)

মাসআলাঃ কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, রাস্তা মেরামত বা নির্মাণ করা জায়েয নয়। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৮-৩২৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৪৯৫, কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৪২)

মাসআলাঃ পশুর দেহ থেকে চামড়া পৃথক করার পূর্বে তা বিক্রি করা নাজায়েয। (আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২৯)

মাসআলাঃ কুরবানীর পশুর পুরো চামড়াটাই হাদিয়া করে দেয়া যেতে পারে। তবে বিক্রি করলে তার মূল্য গরীবকে দান করা জরুরী। বিক্রয়লব্ধ চামড়ার মূল্যটা হুবহু ঐভাবেই প্রাপ্যদের হাতে পৌঁছে দেয়া উচিত। টাকাটা কোনো কাজে খরচ করে পরবর্তীতে সমপরিমাণ টাকা নিজের

থেকে পরিশোধ করাটা নিতান্ত দোষণীয়। তবে দোষণীয় হলেও আদায় হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৮, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩০১)

মাসআলাঃ কুরবানীর গোশত, চামড়া বা তার মূল্য দ্বারা কসাই, যবেহকারী বা অন্য কারো পারিশ্রমিক দেয়া নাজায়েয। পৃথকভাবে তাদের মজুরি দিতে হবে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩২৪১, ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৮, শরহুত তানবীর ৫/৩২১)

মাসআলাঃ কুরবানী দাতার পক্ষে চামড়া দ্বারা বালতি, মশক, জায়নামায প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে ব্যবহার করা বৈধ আছে। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৮)

মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী

মাসআলাঃ মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়। আর সে কুরবানীর গোশত সকলেই খেতে পারে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি তার নিজস্ব মাল থেকে কুরবানী করার ওসীয়ত করে যায়, তাহলে কুরবানীর সম্পূর্ণ গোশত সদকা করে দিতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩৩৫)

মাসআলাঃ একাধিক লোক মিলে এক মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানী করতে পারে। যেমন, ছয় ব্যক্তি কুরবানীর উদ্দেশে একটা গরু খরিদ করল। তাতে ছয় জনের ছয় অংশ থাকল, অবশিষ্ট একাংশ তাদের সকলের ঐক্যমতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা যে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য দেয়া হলো। (ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩১১, ফাতাওয়া শামী ৬/৩৬২)

মাসআলাঃ কারো উপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও যদি সে নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী না করে অন্য কারো পক্ষ থেকে ওয়াজিব কুরবানী করে, তাহলে ঐ কুরবানীর দ্বারা তার নিজের ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে না; বরং তার উপর আরেকটি কুরবানী করা ওয়াজিব হবে। কারণ, একটি কুরবানী দুইজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট নয়। আর যদি কুরবানী নিজের পক্ষ থেকে করে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে সাওয়াব উদ্দেশ্য হয়, তাহলে উক্ত কুরবানীর দ্বারাই তার ওয়াজিব আদায় হবে। (ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/২৪৬, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩০৪)

মাসআলাঃ যে ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, সে যদি কুরবানীর উদ্দেশ্যে পশু খরিদ করে ফেলে, তাহলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৯৪)

মাসআলাঃ নাবালেগ সন্তানদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা মুরুব্বীদের উপর ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব। নাবালেগ ছেলেমেয়ে মালদার হলেও তাদের মাল থেকে কুরবানী করা যাবে না। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩১৬, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/২৯৬)

কুরবানীর গোশতের হুকুম

মাসআলাঃ কুরবানীর গোশত সবাই খেতে পারে। নিজে খাবে, আত্মীয়-স্বজনকে দিবে এবং গরিব-মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করবে। যদি সম্পূর্ণ গোশত নিজে খায়, তবুও নাজায়েয হবে না। তবে উত্তম এই যে, কুরবানীর গোশতকে তিন ভাগ করবে, এক ভাগ স্বয়ং নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্য রাখবে, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনকে এবং এক ভাগ ফকির-মিসকিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিবে। অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ ফকির-মিসকিনদেরকে দেয়া মুস্তাহাব। তবে কেউ যদি সম্পূর্ণ গোশত নিজেই খায়, দান না করে তাও জায়েয আছে। (সূরা হজ্জ- ২৮, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৫৬৯, হিদায়া ৪/৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৮৪, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২৮, ফাতাওয়া আলমগীরী ৫/৩০০)

মাসআলাঃ কুরবানীর গোশত বাসা-বাড়ির চাকর-চাকরানিকে বেতন হিসেবে খাওয়ানো জায়েয হবে না। বেতন হিসেবে না দিয়ে যদি এমনিতেই দেয়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতী মাহদী হাসান সাহেব রহ. বলেছেন, কুরবানী বা আকীকার গোশত বেতনের মধ্যে শামিল হবে না। কারণ, মালিক যখন ঐ গোশত স্বীয় ঘরে এনে পাকায় তখন কুরবানীর গোশতের হুকুম খতম হয়ে সাধারণ খানার ন্যায় হয়ে যায়। কাজেই চাকরকে খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। (ইমদাদুল মুফতীন; পৃষ্ঠা ৮০০, মাসায়িলে ঈদাইন ও কুরবানী; পৃষ্ঠা ১৮৯)

মাসআলাঃ কুরবানীর গোশত অমুসলিমকেও দেয়া যেতে পারে। (আযীযুল ফাতাওয়া ৭৬১, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল ৪/১৩৪)

মাসআলাঃ কারো উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল, কিন্তু সে তিনদিনের মধ্যে কুরবানী করেনি, তাহলে তার উপর একটি ছাগল বা ভেড়া অথবা একটি গরু-মহিষের এক-সপ্তমাংশের মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩২৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/৩৪৬)

মাসআলাঃ কুরবানীর জন্তু ক্রয় করা সত্ত্বেও কুরবানীর সময়ের মধ্যে যদি সে কুরবানী না করে, তাহলে অবিকল সেই জন্তুই সদকা করা ওয়াজিব। উল্লিখিত অবস্থায় সে ঐ জন্তু যবেহ করে গরিবদের মধ্যে বণ্টন করবে। কিন্তু সে উক্ত জন্তুর গোশত খেতে পারবে না এবং কোনো ধনী লোককেও দিতে পারবে না। এটা শুধু ফকির-মিসকিনদেরই হক। (ফাতাওয়া শামী ৬/৩২১)

মাসআলাঃ কুরবানীর পশু যবেহ করে তার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয আছে। বরং বিনিময় নেয়াটা যবেহকারীর হক। তবে সেই বিনিময় কুরবানীর গোশত বা চামড়ার দ্বারা লেনদেন করা নিষেধ। অবশ্য কেউ যদি আল্লাহর ওয়াস্তে অন্যের জন্তু যবেহ করে দেয় তাহলে এটা তার জন্য উত্তম। (আযীযুল ফাতাওয়া ১/৬৬৯, কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৪৩)

মাসআলাঃ হালাল প্রাণীর আটটি অংশ খাওয়া নিষেধ। যথা- (১) পুরুষ লিঙ্গ, (২) স্ত্রী লিঙ্গ, (৩) মূত্র থলি, (৪) পিঠের হাড়ের ভিতরের মগজ বা সাদা রগ, (৫) চামড়ার নিচের টিউমারের মতো উঁচু গোশত, (৬) অণ্ডকোষ, (৭) পিত্ত এবং (৮) প্রবাহিত রক্ত।

উল্লেখ্য যে, শুধু প্রবাহিত রক্ত খাওয়া হারাম, আর অবশিষ্টগুলো মাকরূহে তাহরীমী। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৬/২১৭, আল-বাহরুর রায়িক ৮/৪৮৫, তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/২২৬)

একটি উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আত্‌তাখাসসুস ফিলফিকহি ওয়ালইফতা) বছিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

ইলমে দীন ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ভাবনা

শাইখুল হাদীস, মুফতী সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দা.বা.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا.

বর্ণিত আয়াতে একই বিষয় বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অংশ اليوم اكملت لكم دينكم অর্থ, আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছি।

উলামায়ে কেরাম বলেন, এ আয়াত নাযিলের পর আহকাম বিষয়ক আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। আহকাম সংবলিত যত আয়াত আছে সব এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর ওহী তো এসেছে, কিন্তু আহকাম এর পূর্বেই এসেছিল; পরে নয়। সুতরাং বর্ণিত আয়াতে দীন দ্বারা উদ্দেশ্য আহকাম। আহকাম দীনের মূল বিষয়। যদি আহকামের উপর আমল না থাকে তবে সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত হলো বাদাম বিহীন (বাদামের) খোসা। দেখতে খুব শানদার কিন্তু ভিতরটা শূন্য।

দীনের ভিত্তি হল আকায়েদ। আকায়েদ হল শিকড়তুল্য, যার উপর আহকামের ডালপালা ছড়ায়। তবে এটা হল এক দিক বিবেচনায়। এক্ষেত্রে আরেকটি দিক হল, শাখা-প্রশাখাই বেশি উপকারে আসে। আম গাছের শিকড় খনন করে কী পাওয়া যাবে? ডাল বা শাখায় আম ধরলেই না উপকৃত হওয়া যাবে। মোটকথা, এক জিনিসকে বিভিন্নভাবে বিবেচনা করা যায়। এক বিবেচনায় দীনের ভিত্তিমূল আকায়েদ। আর আকায়েদের উপরই দীনের ডালপালা ছড়িয়েছে। কিন্তু পরিণাম বিচারে গাছের ফলই আসল। দীনের আহকাম হল দীনের ফল এবং আহকামই দীনের মূল উদ্দেশ্য। তাই আহকাম অবতীর্ণ হয়ে যখন তা পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল তখন এই আয়াত নাযিল হল।

দীন আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত; নেয়ামতের শোকরগুজারীর পদ্ধতি

এরপর একই বিষয়বস্তু আল্লাহ তা'আলা ভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। ইরশাদ করেন, واتممت عليكم نعمتي অর্থ, আমি তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। অর্থাৎ দীন যা আল্লাহ তা'আলা পূর্ণাঙ্গ করেছেন, এটা আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নেয়ামত। নেয়ামতের শোকরগুজারী আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি আমার নেয়ামতের শুকরিয়া করো আমি নেয়ামত বাড়িয়ে দিবো। আর যদি নাশোকরী করো (জেনে রেখো) আমার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।

আয়াতের এ অংশে যে জিনিসকে নেয়ামত বলা হল, সে জিনিসকেই প্রথম অংশে দীন বলা হয়েছে। আর এখানে 'দীন' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'আহকাম'। সুতরাং আহকামকে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত বললেন।

প্রত্যেক নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের পদ্ধতি ভিন্ন হয়। সম্পদের শুকরিয়া আদায়ের পদ্ধতি হল, জায়েয পন্থায় উপার্জন করা এবং জায়েয পথে খরচ করা। কিন্তু কেউ যদি জায়েয-নাজায়েযের পরওয়া না করে সম্পদ উপার্জন করে কিংবা উপার্জন করল জায়েয পন্থায় কিন্তু ব্যয় করল যেখানে সেখানে, অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশিত পথে খরচ করল না। এতে মালের শুকরিয়া তো করা হল না; বরং নাশোকরিই হল।

তদ্রূপ কারো সন্তান আছে। তো সন্তানের ক্ষেত্রে শুকরিয়া আদায়ের এক পন্থা, আবার স্ত্রী থাকলে তার ক্ষেত্রে শুকরিয়া আদায়ের ভিন্ন পন্থা। অনুরূপ পিতা-মাতা থাকলে তাদের শুকরিয়া আদায়ের পন্থাও অন্য রকম।

দীনও এক বড় নেয়ামত। এর শুকরিয়া আদায়ের পন্থা হল, দীনের বিধি-বিধান মেনে চলা। সে অনুযায়ী আমল করা।

নাজাতের একমাত্র পথ দীনে ইসলাম

ঠিক একই বিষয়বস্তু আল্লাহ তা'আলা আরেকভাবে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, ورضيت لكم الاسلام دينا অর্থ, আমি তোমাদের জন্য পছন্দ করেছি দীনে ইসলামকে। অর্থাৎ এ দীন নিয়ে আমার কাছে আসতে পারলে জান্নাতের নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত হবে, অন্যথায় মাহরুম থাকবে। ইসলাম কী? ইসলাম তো আহকামের নাম। ঈমান হল আকীদার নাম। ঈমানের অর্থ, অন্তরে বিশ্বাস করা, আর ইসলামের অর্থ হল, মাথা পেতে মেনে নেয়া। আল্লাহ তা'আলা যে আহকামের কথা বলেছেন তার সামনে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়া। যে ব্যক্তি ইসলামকে এভাবে মেনে নিল সেই উত্তম ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

انا عرضنا الامانة على السموات ...

আমি এ আমানত পেশ করেছিলাম আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের সামনে। তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল ও শঙ্কিত হল আর তা বহন করে নিল মানুষ।

ইসলামে পরিপূর্ণ দাখেল হতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يا ايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة.

অর্থ : হে মুমিন সকল! ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ কর। আয়াতে কারীমায় ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে। কারণ কেউ এমনও হতে পারে যে, তার এক পা ইসলামের নৌকায় আর অপর পা অন্য নৌকায়। বর্তমানে অনেক মুসলমান এমন রয়েছে, যে জুম'আর নামায পড়তে আসে, কিন্তু জুম'আর দিন আছরে আসে না, ফজরে আসে না। জুম'আয় আসা তো খারাপ কিছু নয়। কিন্তু জুম'আর দিন ফজর, আসরে না আসা হল অন্যায়। অনেক মুসলমানকে দেখা যায়, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, কিন্তু চেহারা একেবারে পরিষ্কার; দাড়ি মুণ্ডায়। আল্লাহর রাসূলের চেহারার সাথে তার

কোন প্রকার মুহাব্বত নেই; বরং বিদ্বেষ। তাহলে এ ব্যক্তি যে নামায পড়ছে, কার আনিত হুকুমের উপর আমল করছে?

এমন মুসলমানের ব্যাপারে বলা হয় এক পা ইসলামে, এক পা বাইরে। এক পা রাসূলের আনুগত্যের জন্য সঁপে দিয়েছে অপর পা সঁপেছে চাকুরী, ফ্যাশন ইত্যাদি পালনের জন্য।

শিক্ষা ব্যবস্থা দু'ভাগে বিভক্ত

এখন আমরা মূল বিষয়ের আলোচনায় আসি। শিক্ষা ব্যবস্থা দু'ভাগে বিভক্ত। **(এক)** দীনী শিক্ষা ব্যবস্থা, **(দুই)** দুনিয়াবী শিক্ষা ব্যবস্থা। কুরআন-হাদীসে এই দুই শিক্ষা ধারার স্তর ভিন্ন ভিন্ন বলা হয়েছে। একটিকে 'জরুরী' বলা হয়েছে। অপরটিকে 'পছন্দনীয়' বলা হয়েছে। উভয়টিকে ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বলা হয়েছে।

শরীয়তে এভাবেই মাসআলা-মাসাইলের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ হালাল রিযিক কামাই করা ফরয। কিন্তু এটা হল দ্বিতীয় স্তরের ফরয। হাদীসে এসেছে,

كسب الحلال فريضة بعد الفريضة.

হালাল রুজি কামাই করা ফরয। কিন্তু তার অবস্থান হল প্রথম স্তরের ফরযের পর। উভয় স্তরের খেয়াল রেখে চলা আবশ্যক। নামায, রোযা এবং হজ্জ প্রথম স্তরের ফরয। সুতরাং এই স্তরের ফরয আদায়ের পর হালাল রুযি কামাইয়ে মনোনিবেশ করতে হবে।

در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق
ہر ہوسنا کہ نہ داند جام وسندان باختن۔

অর্থ : অনভিজ্ঞ আশিক শরীয়তের নাযুক পেয়ালা আর ইশক ও মুহাব্বতের হামানদিস্তা নিয়ে খেলতে জানে না। কাচের পেয়ালায় লোহার কাঠির পরিমিত আঘাতে সুর-লহরী সৃষ্টি করা কাঁচা লোকের কাজ নয়। একমাত্র ঝুনো ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিই তা করতে পারঙ্গম। অর্থাৎ, এ ধরণের ব্যক্তিই উভয় ফরয নিয়ে একসাথে চলতে পারে। নামায পড়তে হবে, সময় মতো দোকান খুলতে হবে, চাকুরীর দায়িত্বও পুরা করতে হবে। সর্বদিক সামলে চলা সুকঠিন। কিন্তু বান্দা যখন হিম্মত করে আল্লাহ তা'আলা রাস্তা খুলে দেন।

দীন এবং দুনিয়ার মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে দীনের অগ্রাধিকার হবে

যদি দীন-দুনিয়া মুখোমুখি হয়ে যায় এবং অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কঠিন হয়ে পড়ে, তাহলে প্রথম শ্রেণীকে প্রথম স্তরে আর দ্বিতীয় শ্রেণীকে দ্বিতীয় স্তরে রাখতে হবে। নামায এবং দোকানদারীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে নামাযকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ রিযিকদাতা হলেন আল্লাহ তা'আলা; দোকান নয়।

ইংল্যান্ডে এক যুবক কারখানায় চাকুরী করত। রমাযান মাস চলছিল। গরমও ছিল প্রচণ্ড। সে যোহরের সময় বসের কাছে নামাযের অনুমতি চাইল। বস অনুমতি দিল না। রোযা অবস্থায় স্ক্রু তো এমনিতেই ঢিলে থাকে। অর্থাৎ, মেজায-মর্জি স্বাভাবিক থাকে না। অনুমতি না পেয়ে তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। চাকুরির পরওয়া না করে কোট গায়ে সোজা হাঁটা দিল। নিশ্চিন্ত মনে যোহর পড়ে আমার কাছে আসল। বলল, আমি তো এই এই করে এসেছি। বললাম, খুব ভাল করেছ। আল্লাহ তা'আলা তার অন্য আয় রোজগারের ব্যবস্থা করে দিলেন। এখন সে লোকদেরকে ড্রাইভিং শিখায়। বেশ কয়েকটা বাড়ির মালিক। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের জন্য দ্বিতীয় স্তরের ফরয ছেড়ে দিবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য অন্য রাস্তা খুলে দিবেন।

সারকথা হল, যতক্ষণ দুই স্তরের মধ্যে বিরোধ না দেখা দেয় 'জামে শরীয়ত' আর 'সানদানে ইশক' নিয়ে খেল। কিন্তু যখন বিরোধ দেখা দিবে দীনকে প্রাধান্য দিতে হবে। এটাই শরীয়তের সবক এবং এতেই মুমিনের সফলতা।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ইলমকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। 'জরুরী ইলম' হল দীনী শিক্ষা। দীনী শিক্ষা ছাড়া অন্যসব শিক্ষা পছন্দনীয়। হ্যাঁ, কিছু দুনিয়াবী ইলম হারাম। অর্থাৎ যে ধরণের জ্ঞান মানুষের জন্য ক্ষতিকর যেমন, যাদু-টোনা শেখা, জ্যোতিষশাস্ত্র শেখা, গান-বাজনা শেখা ইত্যাদি। এ ধরণের শিক্ষা অর্জন করা হারাম।

দীনী ইলম ছাড়া যত ইলম আছে সেগুলোকে দ্বিতীয় নম্বরে রাখা হয়েছে। হাদীসে এসেছে,

طلب العلم فريضة على كل مسلم.

অর্থ : ইলমে দীন হাসিল করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এ হুকুম নারী পুরুষ সকলের জন্য বরাবর। পুরুষের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। এই হাদীসে ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য দীনী ইলম। দুনিয়াবী ইলম বা জাগতিক জ্ঞান উদ্দেশ্য নয় এবং এক্ষেত্রে এ হাদীস ব্যাপকও নয়।

কিছু লোকের ভুল ধারণা রয়েছে। তারা এ হাদীসকে ব্যাপক মনে করে। দীনী ইলম এবং দুনিয়াবী ইলম উভয় ইলমকে এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। এটা ঠিক নয়। তো ইলমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে,

العلم ثلاثة: اية محكمة اوسنة قائمة فريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل.

অর্থাৎ জরুরী ইলম তিন ধরণের- (১) কুরআনে কারীমের ইলম (اية محكمة), (২) হাদীস শরীফের ইলম (سنة قائمة) এবং (৩) আহকামের ইলম অর্থাৎ ফিকহের ইলম (فريضة عادلة)। এছাড়া যত ইলম আছে সব হল পছন্দনীয় ইলম, সেগুলোরও ফযীলত আছে। সেই ইলমও মাথার তাজ (কিন্তু জরুরী নয়)। (وماسوى ذلك فهو فضل) নাহব-সরফের ইলম, আদব-ইনশার মা'রিফাত, মানতিক-ফালসাফার যোগ্যতা, ইতিহাস শেখা, চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করা এ সবই ফযীলতের বিষয়। কিন্তু এগুলো হল দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞান। প্রথম স্তরের ইলমের পর এর অবস্থান; তার আগে নয়। ভাষাজ্ঞানের ব্যাপারও এমন। হিন্দি, ইংরেজি জানা খারাপ কিছু নয়; বরং পছন্দনীয়। কিন্তু জরুরী ইলমের মধ্যে এসব পড়ে না। প্রথমে কুরআন পড়তে ও জানতে হবে, এরপর অন্যান্য ভাষা।

তদ্রূপ মাদরাসাগুলোতে যে ইলম পড়ানো হয় সেগুলোও সব এক স্তরের নয়। মাদরাসায় যে ইলম পড়ানো হয় সেগুলো দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (এক) علوم عالية মৌলিক ইলম। (দুই) علوم آلية সহায়ক ইলম।

অর্থাৎ এক প্রকার জ্ঞান হল 'জরুরী ইলম' যে উদ্দেশ্যে মূলত এই মাদরাসাগুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রকার ইলম তিন বা ছয় বিষয়ের ইলম। (১) কুরআন, (২) হাদীস, (৩) ফিকহ। এ তিন প্রকারের সঙ্গে এগুলোর মূলনীতি মিলানো হলে মোট ছয়টি বিষয় হবে। অর্থাৎ (৪) উসূলে তাফসীর, (৫) উসূলে হাদীস, (৬) উসূলে ফিকহ।

এই ছয় প্রকারের ইলম হল 'জরুরী ইলম'। বাকী যে ইলম মাদরাসায় পড়ানো হয় সেগুলো হল 'সহায়ক ইলম'। অর্থাৎ যে ইলম শেখানোর জন্য মাদরাসার প্রতিষ্ঠা তার সহায়ক ইলম। মাদরাসায় এগুলোকে সহায়ক হিসেবেই পড়ানো হয়; মূল হিসেবে নয়। তো 'জরুরী ইলম' এর সহায়ক ইলমই যেখানে ফরয ও উদ্দেশ্যের মর্যাদা রাখে না, তাহলে যে ইলম শুধু দুনিয়াবী লাভের জন্য শেখা হয় কীভাবে তা মূল এবং ফরযের মর্যাদা পেতে পারে? এ ধরণের ইলমকে বেশির চেয়ে বেশি 'সম্মান'-এর মর্যাদা দেয়া যেতে পারে, পছন্দনীয় বলা যেতে পারে। তার বেশি কিছু নয়।

দুই নৌকায় পা রেখে চলা সম্ভব নয়

এ বিষয়টিও ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, দীনী এবং দুনিয়াবী ইলম একটা পর্যায় পর্যন্ত একসঙ্গে চলতে পারে। চূড়ান্ত ধাপ পর্যন্ত একসঙ্গে চলতে পারে না। মাদরাসাগুলোতে দু'ধরণের ইলম একসঙ্গে নিয়ে চলার প্রচলন আছে। স্কুলেও তাই। প্রাথমিক পর্যায়ে একাধিক বিষয়ের পড়ালেখা একসঙ্গে চলতে পারে। কিন্তু যখন কলেজের প্রসঙ্গ আসবে, বিভাগ আলাদা হয়ে যাবে তখন যে কোন এক বিষয় নিয়ে পড়তে হবে। মাদরাসায়ও যতদিন প্রাইমারী, সেকেন্ডারী স্তরে পড়া-শোনা হবে ততদিন সব বিষয় পড়ানো হবে। ভাষাজ্ঞানও দেয়া হবে, অঙ্কও-ভূগোলও শেখানো হবে। সাথে সাথে তা'লীমুল ইসলাম, দীনী তা'লীমের কিতাবাদী, নাযেরা, কুরআন শরীফ সব পড়ানো হবে। কিন্তু একটা স্তরে গিয়ে অন্য সব বাদ পড়ে যাবে। যে মৌলবী হতে চায় তার জন্য মাওলার (আল্লাহর) ইলমে মনোনিবেশ করতে হবে।

'মাওলা' আল্লাহ তা'আলার সিফাত। (نعم المولى ونعم النصير) সে হিসেবে মৌলবী কথাটির অর্থ হল, এমন ব্যক্তি যার আল্লাহ তা'আলা এবং তার দীনের জরুরী ইলম হাসিল আছে। 'আলেমের' স্তর মৌলবীরও উপরে। মৌলবী হওয়া সহজ। প্রতি বছর হাজারো মৌলবী তৈরি হচ্ছে। কিন্তু আলেম খুব কম তৈরি হয়। যে ব্যক্তি কোন মাদরাসা থেকে ফারেগ হয় সাধারণত সে আল্লাহওয়ালা হয়েই বের হয়। তার বেশ-ভূষা, চাল-চলন, জীবন-যাপন সব শরীয়ত মুতাবেক হয়। এ ব্যক্তিই আল্লাহওয়ালা। এ কথা মানতে হবে যে, চালের মধ্যে পাথরকণা থাকবেই। কোন মৌলবীকে যদি আল্লাহওয়ালা নাও মনে হয় এতে অভিযোগের কিছু নেই। কিন্তু আলেম হওয়ার জন্য ফারেগ হওয়ার পর অনেক কিছু করতে হয়। দীর্ঘ একটা সময় কিতাবের পোকা হয়ে থাকতে হয়। তখন ইলমে দীনে পরিপক্কতা ও পূর্ণতা সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে এ পর্যায়ে পৌঁছলে একজন ব্যক্তিকে আলেম বলা সাজে। তো বলছিলাম একজন তালিবে ইলম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে যখন আলেম হওয়ার স্তরে পদার্পণ করবে তখন তাকে একটি লাইনই অনুসরণ করতে হবে। তখন আর দুই নৌকায় পা রেখে চলা সম্ভব নয়। অন্যথায় ধোপার কুকুরের অবস্থা হবে। যে কিনা ঘরেরও নয়, ঘাটেরও নয়। ঘরের লোকেরা এ মনে করে খাবার দেয় না যে, ঘাটে খেয়ে নিয়েছে। আর ঘাটের লোক এই মনে করে খাবার দেয় না যে, ঘরে খেয়ে এসেছে।

যারা চায়, মাদরাসায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করা হোক, তাদের এই দাবী-দাওয়া প্রাইমারী স্তর পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু শেষ স্তর পর্যন্ত উভয় ইলম একসঙ্গে চলা কিছুতেই সম্ভব নয়। অন্যথায় মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। মাদরাসা তখন জেনারেল শিক্ষার কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। মকতবে এতসব বাধ্য-বাধকতা নেই। স্কুলেও এমন। স্কুলে নিচের স্তরে অনেক বিষয় পড়ানো যেতে পারে। বরং দীনী ইলম ও আধুনিক শিক্ষা একসঙ্গে চলতে পারে। কিন্তু যখন কলেজের প্রসঙ্গ আসবে তখন এক লাইন আঁকড়ে ধরতে হবে। এক লাইনে চলতে হবে। উভয় লাইনে একসঙ্গে চলা যাবে না। কারণ এখন এক বিষয়ই এত ভারী যে, সামাল দেয়া কঠিন। এ অবস্থায় যদি সব একসাথে চাপিয়ে দেয়া হয় তবে সে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে মরবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না।

বয়ান: শাইখুল হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ, ইউ.পি. ইন্ডিয়া।

অনুবাদ: মাওলানা আব্দুল হান্নান মুদাররিস, জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

(সম্পাদকীয়; ২ নং পৃষ্ঠার পর)

শয়তানের মুখোশ খুলে দেন। তাতে হাতে গোনা কিছু লোকের ঘুম ভাঙ্গে বটে, কিন্তু হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে করণীয় ঠিক করতে পুরোপুরি সফল হয় না। ইয়াহুদ-নাসারাকে বর্জন না করে শুধু পণ্য বর্জনের আহ্বান তারই একটি নমুনা। নাপিত আর চামারের সাথে বন্ধুত্ব বহাল রেখে তাদের দ্বারা চুল ক্ষৌরকাজ না করানো ও জুতা-স্যান্ডেল মেরামত না করানো যেমন হাস্যকর, ইয়াহুদ-নাসারার বন্ধুত্ব ও খাসলত না ছেড়ে শুধু পণ্য বর্জন তেমনই হাস্যকর। অথচ দরকার হল তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পরিহার করা। তাদের খাসলত বর্জন করা। অতঃপর প্রয়োজন হলে তাদের পণ্যও বর্জন করা। বিতির নামাযে দু'আয়ে কুনূতে আমরা প্রত্যহ পড়ে থাকি, ونخلع ونترك من يفجرك 'হে আল্লাহ! আমরা প্রত্যাখ্যান করি ও বর্জন করি আপনার অবাধ্যকে।' কিন্তু আমাদের অনেকের জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগ নেই। কাজেই আমরা শয়তানের দলের হাতে জিম্মি ও পরাজিত। জাতীয় পর্যায়ে এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে মুসলিম জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন কখনও হবে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কালজয়ী মুহাদ্দিস আল্লামা হেদোয়াতুল্লাহ রহ.

মাওলানা আহমাদুল্লাহ

তাকে দেখামাত্রই দর্শকপ্রাণে এক অনুপম মুগ্ধতা ছুঁয়ে যেতো। তার সান্নিধ্যে প্রতিটি হৃদয়ে শীতল পরশ অনুভব হতো। তার আচরণ এবং উচ্চারণে সবাই বিমুগ্ধ হতো। তিনি মজলিসে আগমন করলে সবার পেছনে বসার চেষ্টা করতেন; তবুও সবাই নড়েচড়ে বসতো এবং তাকে মজলিসের মধ্যমণি মনে করতো। সকলে কথা বলতো; তিনি চুপ থাকতেন। যখন দু'এক কথা বলতেন, সবাই নীরব হয়ে যেতো, কান পেতে তার কথা শোনার চেষ্টা করতো। লোকেরা দূর থেকে, আড়াল থেকে তার কর্ম-পদ্ধতি রপ্ত করার চেষ্টা করতো আর ভাবতো, এটাই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত; আমরা তো হাদীসে এমনটিই পড়েছি। মুজাহিদে আযম রহ. তার এ শাগরেদকে যথাযথই চিনেছেন; তাকে 'চলন্ত কুতুবখানা', 'ইলমের অকূল সমুদ্র'সহ বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তার কাজ-কর্ম, আখলাক-চরিত্র ও চলাফেরা এতোই সুন্দর, সুনিপুণ এবং নিখুঁত ছিল যে, হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. এর 'রাজদরবারে' দীর্ঘ একটি বছর কাটিয়েছেন কিন্তু তাকে কখনও তিরস্কারের মুখোমুখি হতে হয়নি। তিনি হলেন এশিয়ার বে-নযীর মুহাদ্দিস আল্লামা হেদায়াতুল্লাহ রহ.।

জন্ম ও বংশ

১৯১৪ ঈসাব্দে চাঁদপুর জেলার মুমিনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। পিতার নাম শাহ মুবারকুল্লাহ। দাদার নাম শাহ কাসেম। পরদাদার নাম শাহ হাসান। এই শাহ হাসান রহ. ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। ১২০৬ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৭৯৯ ঈসাব্দে তিনি এ বঙ্গভূমিতে আগমন করেন।

শিক্ষা

স্বীয় পিতা মুন্সী মুবারকুল্লাহ রহ. ও বড় ভাই মাওলানা ছফিউল্লাহ রহ. এর নিকটে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর ইলমে দীন অর্জনের জন্য বড় ভাইয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে যান। বড় ভাই মাওলানা ছফিউল্লাহ ছাহেব ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামি'আ ইউনুসিয়ার উস্তাদ। সেখানে হেদায়া-জালালাইন পর্যন্ত পড়ার পর ১৩৫১ হিজরীতে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. (১৩৫৭ হিজরী পর্যন্ত) দীর্ঘ ছয় বছর সেখানে লেখাপড়া করেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি দেওবন্দ ও থানাভবন ছাড়া অন্য কোথাও যাননি। তিনি বলেছেন, আমার সঙ্গীরা আগ্রার তাজমহল, দিল্লির কুতুবমিনার দেখতে গিয়েছে। কিন্তু এসব দেখার ইচ্ছাই আমার কখনও জাগেনি। দেওবন্দ পড়াকালীন তার পিতা-মাতার ইন্তেকাল হয়েছে, কিন্তু সচেতন অভিভাবক তার পড়া-লেখার ক্ষতি হবে ভেবে সংবাদ দেয়া সমীচীন মনে করেননি। দেওবন্দের ছয় বছর আর থানাভবনের এক বছর এই সাত বছরে মাত্র একবার বাড়িতে এসেছিলেন। সদা লেখাপড়ায় মগ্ন থাকতেন। তার ও তার কিছু সঙ্গীর লেখা-পড়ার মগ্নতা দেখে অন্যরা অবাক হতো। এমনকি কেউ কেউ এঁদেরকে জিন মনে করতো। রাত-দিন কিতাবের মধ্যে ডুবে থাকতেন। এ সময় নিজের শরীর, জামা-কাপড় ইত্যাদির প্রতি কোন খেয়ালই থাকতো না। ছাত্র যামানায় উস্তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন কাজ করতেন না। উস্তাদদের প্রতি তার সীমাহীন ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আযমত-এহতেরাম ছিল। যার উপমা সেকালেও বিরল ছিল, আর এখন তো কল্পনাতীত। এমনকি বিনা প্রয়োজনে উস্তাদদের নাম উচ্চারণ করাকেও তিনি আদবের খেলাফ মনে করতেন। নামের পরিবর্তে তাদের উপাধি ব্যবহার করতেন। যেমন বলতেন, হযরত মাদানী রহ., হযরত ছদর ছাহেব রহ. ইত্যাদি। উস্তাদের সামনে নিজেকে মক্তবের শিশু মনে করতেন। তাদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসতেন।

উস্তাদবৃন্দ

মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ., হযরত পীরজী হুযূর রহ., হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ., শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহ., শাইখুল আদব ই'যায আলী রহ., মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. প্রমুখ বিশ্বনন্দিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তার উস্তাদবৃন্দ।

তাসাওউফ

দেওবন্দে পড়াকালীন প্রায় সকল ছুটি এবং ফারেগ হওয়ার পর লাগাতার এক বছর হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. এর সোহবতে থেকে কঠোর রিয়াযাত ও মুজাহাদার মাধ্যমে ইলমে মা'রিফাতে কামালিয়াত হাসিল করেন। হযরত থানবী রহ. এর জীবদ্দশায় তারই নির্দেশে থানাভবনের ছোট হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রহ. কে নিজের ইসলাহী মুরুব্বী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং কারও কারও মতে তার কাছ থেকে খেলাফত লাভ করেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব আমলীভাবে উপস্থাপন করার জন্য করাচীর হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ. এর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করেন। হাকীম আখতার ছাহেব রহ. তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাফতের সম্মানে ভূষিত করেন।

কর্মজীবন

দেওবন্দ থেকে দেশে ফিরে প্রথমে হুসাইনিয়া আশরাফুল উলুম বড় কাটারা মাদরাসায় যোগদান করেন। এখানে দীর্ঘ ১২ বছর হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে দরসদান করেন। তারপর ১৩৭০ হিজরীতে লালবাগ জামি'আ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর স্বীয় মুরুব্বী হযরত ছদর ছাহেব রহ. এর সঙ্গে লালবাগ চলে আসেন। এখানে ১৮ বছর নায়েবে মুহতামিম ও ১৬

বছর মুহতামিমের দায়িত্ব পালনসহ মোট ৩৪ বছর ইলমে নববীর খিদমত আঞ্জাম দেন। পরিশেষে ১৯৮৪ সাল থেকে জীবনের শেষ ১২ বছর যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় দরস-তাদরীসের খিদমত আঞ্জাম দেন।

লালবাগ জামি'আ ও মুহাদ্দিস ছাহেব রহ.

জামি'আ কুরআনিয়া লালবাগের বিস্ময়কর ও বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জনের মূলে যে সব আকাবিরের ইখলাছ, মেহনত, মেধা ও দু'আ রয়েছে তাদের মধ্যে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। লালবাগ মাদরাসার স্বর্ণালী ইতিহাস রচনায় হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর অনেক ভূমিকা ছিল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দীর্ঘ ৩৪ বছর পর্যন্ত দুনিয়ার সবকিছু এমনকি আপন পরিবার-পরিজন থেকেও অধিক আপন করে নিয়েছিলেন লালবাগ জামি'আকে। গভীর মমতা, নিখাদ ইখলাছ, প্রখর মেধা, সঠিক সিদ্ধান্ত, অক্লান্ত পরিশ্রম ও শেষরাতের রোনাযারী দিয়ে লালবাগ জামি'আকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন। ইলমী, আমলী ও আখলাকী দিক দিয়ে বিশ্বের সেরা বিদ্যাপীঠে রূপান্তরিত করেছিলেন। মূলত লালবাগ জামি'আ আর মুহাদ্দিস ছাহেব ছিলেন একে অপরের সমার্থক। একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হওয়ার জন্য যে দু'টি বিশেষ গুণের প্রয়োজন তা তার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। একটি হল আমানতদারী, অপরটি হল ঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। হযরত ছদর ছাহেব রহ. তাকে 'আমীনু হা-যিহিল উম্মাহ' ও 'সায়িবুর রায়' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। হযরতের মধ্যে ছিল আল্লাহ প্রদত্ত এক অনুপম গাম্ভীর্য ও স্বভাবজাত রহম ও ঔদার্য। ফলে লালবাগের সকল শিক্ষক এবং প্রতিটি ছাত্রের অন্তর হযরতের আযমত ও ভালোবাসায় ভরপুর ছিল। হযরতের মধ্যে দায়িত্ববোধ ছিল খুব বেশি। যার প্রভাবে সকল শিক্ষক ও কর্মচারী দায়িত্ব পালনে সচেতন ছিলেন। কোন ভুল-চুক হয়ে গেল কি না এবং মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর তা জেনে গেলেন কি না– এ আশঙ্কায় সবাই সতর্ক থাকতেন। সে যুগে কামরায় কামরায় গিয়ে ছাত্রদের খোঁজ-খবর নেয়ার প্রয়োজন হতো না। হুযূর নিজ কামরায় বসে থাকতেন আর গোটা মাদরাসায় তার প্রভাব বিরাজ করতো। মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর শুধু ছুটির সময় বাড়ি যেতেন। ছুটির একদিন পরে যেতেন এবং খোলার একদিন আগে চলে আসতেন। আবহাওয়া কিংবা অন্য কোন প্রতিকূলতায়ও এর ব্যত্যয় ঘটতো না। তিনি সর্বদা মুতালা'আ ও ইলমী ব্যস্ততায় সময় কাটাতেন। ফলে ছাত্রদের মধ্যেও এর প্রভাব পড়তো। সে যামানায় লালবাগ জামি'আ ছিল আক্ষরিক অর্থেই ইলম-আমলের মারকায। সে যুগে যারা লালবাগ জামি'আয় পড়াশোনা করেছেন তারাই আজ বিভিন্ন মাদরাসার শাইখুল হাদীস, মুফতী, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির পদে অধিষ্ঠিত। জামি'আর সম্পদের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। আমানতদারীর কথা তো বলাই বাহুল্য। এক ফান্ডের টাকা কখনও অন্য ফান্ডে খরচ করতেন না। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. উস্তাদ ছাত্রদের প্রয়োজনের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। সাধ্যমতো তাদের প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যাদি দূর করার ব্যবস্থা করতেন। ছাত্রদের মানিঅর্ডারের টাকা-পয়সা পিয়নেরা হুযূরের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে যেতো। তিনি ছাত্রদের রুমে রুমে খবর পাঠিয়ে তাদের টাকা-পয়সা বুঝিয়ে দিতেন। অনেকে আবার সে টাকা হুযূরের কাছেই জমা রাখতো এবং প্রয়োজন মতো নিয়ে নিয়ে খরচ করতো। লালবাগের মতো বিশাল, ছাত্রবহুল ও শীর্ষখ্যাতিমান মাদরাসার ইহতিমামের কঠিন দায়িত্ব পালনের পরও এসব ঝামেলায় তিনি বিরক্তি বোধ করতেন না। ছাত্রদের ফোন আসলে সাথে সাথে সংবাদ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতেন। কাউকে না পেলে নিজেই গিয়ে ছাত্রদের খবর পৌঁছাতেন। এতো সব ব্যস্ততা সত্ত্বেও নামাযের সময় তাকে মসজিদের প্রথম কাতারে দেখা যেতো।

লালবাগ জামি'আ থেকে বিচ্ছেদ

১৯৮১ সালের কথা। লালবাগ জামি'আর শিক্ষা-দীক্ষার সুনাম তখন দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। এ বছরের শেষ দিকে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. দেশব্যাপী তওবার রাজনীতির ডাক দিলেন। তার সীমাহীন ইখলাসের বদৌলতে এ আহ্বান দেশব্যাপী ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করল। ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর পাকা ও চূড়ান্ত মত এই ছিল যে, তিনি রাজনীতিতে ছাত্রদের সর্বপ্রকার সক্রিয় অংশগ্রহণ ক্ষতিকর মনে করতেন। তিনি বলতেন, রাজনীতি করলে ছাত্রদের তবিয়ত বিগড়ে যায়, বে-পরওয়া ভাব চলে আসে, সর্বোপরি লাগামহীন হয়ে যায়। এ ব্যাপারে তার শরহে ছদর (আত্ম-প্রত্যয়) ছিল, তাই তিনি স্বীয় অবস্থানের ওপর অটল-অবিচল ছিলেন। তবে তার এ অবস্থান ছিল একেবারে নীরব ও শান্ত। এ ব্যাপারে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর মতও প্রায় অভিন্ন ছিল। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. প্রায়ই বলতেন, 'লেখা-পড়াই হল ছাত্রদের আসল রাজনীতি'। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত ১৪০৩হি. – ১৪০৪হি. শিক্ষাবর্ষে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঘটনা অনেক দূর গড়িয়ে গেল। উস্তাদদের কিছু সংখ্যক এবং ছাত্রদের বিরাট একটি অংশ সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করল। এটা ছিল মাদরাসার মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. কিছুদিন পর্যন্ত নীরবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। যখন দেখেছেন পড়া-লেখার পরিবেশের ওপর রাজনীতি প্রাধান্য লাভ করেছে, তিনি জামি'আর ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছেন। তারপর ফেতনা-ফাসাদ দূরের কথা, মুখে অভিযোগ বা অনুযোগের একটি শব্দও উচ্চারণ না করে নীরবে জামি'আ থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য

কম কথা বলা, গাম্ভীর্য, লাজুকতা, সরলতা, আত্মবিলোপ, বিনয় ও নম্রতা ছিল তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। আকাবিরদের মধ্যে তার মতো কম কথা বলতে কাউকে দেখা যায়নি। শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. বলেছেন, 'সকলের কাছে তিনি স্বল্পভাষী বুযুর্গ হিসেবে পরিচিত ছিলেন।' কোন মজলিসে বসলে সকলে কথা বলতেন; তিনি চুপ থাকতেন। এই মিতবাক স্বভাব

সকলের জানা থাকার কারণে কেউ তাকে বয়ানের জন্য দাওয়াত দেয়ার হিম্মত এমনকি কল্পনাও করতো না। আল্লাহ তা'আলা তাকে জন্মগতভাবে লাজুকতার সর্বোচ্চ মাকাম দান করেছিলেন। তার প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ থেকে লাজুকতা ঝরে ঝরে পড়তো। কারো চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারতেন না। কারো সামনে খালি গা' হতেন না– মাদরাসায়ও না, বাড়িতেও না। কারো সামনে মেসওয়াক করতেন না। ছাত্রদের ভীড়ের মধ্য দিয়ে বায়তুল খালায় যেতেন না। কারো সামনে পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন করতেন না, লুঙ্গি বাঁধতেন না।

বিনয় ও আত্মবিলোপ ছিল তার জীবনের অনন্য ভূষণ। নিজেকে গোপন করে রাখার সযত্ন প্রচেষ্টা ছিল তার। তাহাজ্জুদের নামায রাত ক'টায় উঠে পড়তেন সাধারণ ছাত্ররা তাও টের পেতো না। তার যিকির-আযকারের খবরও তেমন কারো জানা ছিল না। নামাযের কাতারে ইমামের বরাবর দাঁড়াতেন না, যাতে লোকজনের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়ালে রাখা যায়।

তিনি বিনয় ও নম্রতার এক জীবন্ত প্রতীক ছিলেন। প্রতি কদমে ভাবনা ছিল নিজেকে আরো কতো ছোট করবেন। যেন যমীনের উপর দিয়েই হাঁটবেন না; যমীন আরও নিচু হলে আরও নিচু হয়ে চলবেন। নিজের অধিকাংশ কাজ নিজেই করতেন, কাউকে কোন কাজের হুকুম করতেন না।

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর রহ. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হতেন না। বিপদ-আপদ বা সমস্যাবলীতে বিচলিত হতেন না। ইহতিমামের এতো বড় দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া সত্ত্বেও ব্যস্ততা, দৌড়-ঝাঁপ কিংবা হাঁকডাক পরিলক্ষিত হতো না। সব সময় স্থির ও প্রশান্ত থাকতেন। হাঁটলে মনে হতো ইলম ও গাম্ভীর্যের এক পাহাড় যাচ্ছে। মনে হতো যমীন তার ভার বরদাশত করতে পারছে না। কাঁধে সব সময় একটি গামছা থাকতো যা হজ্জের সফরে এবং বিমানেও তার সঙ্গ ছাড়েনি।

ইলমী মাকাম

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. ছিলেন ইলমের কূল-কিনারাহীন এক মহাসমুদ্র, যার বিশালতা ও গভীরতা পরিমাপ করা অসম্ভব। হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, নাহ্‌ব, সরফ, বালাগাত, মানতিকসহ ইলমে দীনের সকল শাস্ত্রে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইলমে দীনের যে কোন বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সঠিক উত্তরটি পাওয়া যেতো। এমনকি বিষয়টি কোন কিতাবের কত পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে তাও বলে দিতেন। কিন্তু বিনয় বশত কিতাবের নাম ও পৃষ্ঠা নম্বরটি 'সম্ভবত' শব্দযোগে বলতেন। প্রশ্নকারী বুঝতেন, মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূরের 'সম্ভবত' কথাটি 'নিশ্চয়' এর অর্থ দেয়। আল্লামা ইউসুফ বানুরী রহ. বলেছেন, বর্তমানে কারও দরসে-হাদীসের প্রতি আমার আস্থা হয় না, কেবল মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ ছাহেবের দরসে-হাদীসের ওপর আস্থা হয়। আল্লামা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেছেন, হযরত মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ ছাহেব এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় আলেম। মুফতী ওলী হাসান টুংকি রহ. বলেছেন, বাংলাদেশে মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ ছাহেবের মতো লোক থাকতে হাদীস পড়ার জন্য পাকিস্তানে আসার প্রয়োজন নেই। শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ছাহেব রহ. বলেছেন, আমাদের সকলের ইলম একত্রিত করলেও হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূরের ইলমের সমান হবে না। মাওলানা আতাউর রহমান খান রহ. লিখেছেন, 'উস্তাযুল হাদীস মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ ছাহেব ইলমে হাদীসের জগতে এক অনন্য স্থান দখল করেছিলেন। জুনায়েদ বাগদাদী, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. ইলমী জগতের এ তিন প্রতিভার সুন্দর সমাহার ঘটেছিল তার ব্যক্তিত্বে।' হযরত ছদর ছাহেব রহ. তালিবে ইলমদের লক্ষ্য করে বলতেন, লালবাগ জামি'আয় দু'টি কুতুবখানা আছে; একটি বাহ্যিক কুতুবখানা যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো। আর অপরটি হল যিন্দা কুতুবখানা, সেটি হল মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ ছাহেব।

দরস-তাদরীসের বৈশিষ্ট্য

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. এর কর্মজীবনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অধ্যায় ছিল হাদীস বা অন্যান্য কিতাবের পাঠদান-পদ্ধতি। হযরত ছদর ছাহেব রহ. বলেছেন, এ দেশে হাদীস পড়তে হলে মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ ছাহেবের কাছে পড়া দরকার। হযরত ছদর ছাহেব রহ. আরও বলতেন, মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ ছাহেব যত সুন্দর করে তিরমিযী শরীফ পড়িয়ে থাকেন দু'তিনজন আকাবির ছাড়া বর্তমানে এতো সুন্দর করে পড়ানোর মতো গোটা পৃথিবীতে আর কেউ নেই। হযরত রহ. দরসে যাওয়ার আগে উযু করে দু' রাকা'আত নামায পড়ে নিতেন। সালাম দিয়ে দরসগাহে প্রবেশ করতেন। অত্যন্ত বিনয় ও তাযীমের সাথে উভয় পা ভাঁজ করে পায়ের পাতাদ্বয় ডান/বাম দিকে বের করে বসতেন। গোটা দরসগাহে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করতো। হযরতের প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় ছাত্রদেরকে এমন আচ্ছন্ন করে রাখত যে, কারও সামান্য নড়াচড়া করারও সাহস হতো না। তার দরসগুলো এতোটাই প্রশান্ত হতো যে, ইঁদুরজাতীয় প্রাণীও কামরায় নির্ভয়ে ছুটোছুটি করার সুযোগ পেতো! পান মুখে নিয়ে কখনও সবক পড়াতেন না, আগেই কুলি করে নিতেন। দরস চলাকালীন ছাত্রদের অনর্থক কাজ, নড়াচড়া, এদিক সেদিক তাকানো, পরস্পরে কথা বলা, হাসা কিংবা ঘুমানো তার কাছে বিলকুল অসহনীয় ছিল। অনুরূপ বাম হাত কিতাবের ওপর রাখাও সহ্যের বাইরে ছিল। আলোচনা শেষ করার আগে প্রশ্ন করা অপছন্দনীয় ছিল। তার তাকরীরের পর আলাদাভাবে হাদীসের তরজমা করার প্রয়োজন হতো না। এক একটি কথা ভিন্ন ভিন্ন শব্দে তিন বার বলতেন, ফলে এক বাক্য অন্য বাক্যের ব্যাখ্যা হয়ে শ্রোতাদের মর্ম উপলব্ধি সহজ করে দিতো। বক্তব্যের গতি এমন ছিল যে, ছাত্ররা সকলেই লিখে নিতে পারতো। তার তিরমিযী শরীফের তাকরীর হাদীসের অন্যান্য কিতাবেরও নোট হিসেবে কাজে লাগতো। তার তাকরীর হালের

সেমিনারে পঠিত লিখিত ভাষণের মতোই সুবিন্যস্ত ছিল; অর্থাৎ লিখে ফেললেই কিতাব হয়ে যেতো। যাত্রাবাড়ির হুযূর মাওলানা মাহমূদুল হাসান ছাহেব দা.বা. বলেন, মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর রহ. যে অনুপম বিন্যাসে হাদীসের তাকরীর করতেন তা একান্তই তার উদ্ভাবিত– কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থে পাওয়া যাবে না। মুফতী মনসূরুল হক দামাত বারাকাতুহুম বলেন, তাঁর তাকরীর অধ্যয়নের পর অন্য কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ অধ্যয়ন করে আমরা স্বাদ পাইনি। আর এতো সুন্দর বিন্যাসও কোন কিতাবে পাইনি।

উপদেশাবলী

আল্লাহ তা'আলা আপনার দ্বারা কোন দীনী খিদমত করালে তার বিনিময় চেয়ে নিবেন না। নিলে আল্লাহ তা'আলার তরফের বিনিময় থেকে বঞ্চিত হবেন। আর চেয়ে না নিলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে ইজ্জতের সাথে পালবেন এবং আখেরাতে আজর তো দিবেনই। # সর্বসাধারণের সাথে এমন আচরণ করবেন যে, তারা যেন মনে করে, উলামায়ে কেরাম সত্যিই আম্বিয়া কেরামের ওয়ারিস। # যখন কোন পেরেশানী না থাকে, বুঝতে হবে আল্লাহ তা'আলা আমার ওপর নারায আছেন। ছোট-বড় যাই হোক পেরেশানী থাকার অর্থ হল, আল্লাহ তা'আলা আমার ওপর রাজী আছেন। # তা'আল্লুমী যিন্দেগী (শিক্ষাজীবন) যেভাবে গঠিত হবে পরবর্তী যিন্দেগী সেভাবেই পরিচালিত হবে। # বিপদ যত বড়ই হোক তা স্থায়ী নয়; মুমিনের বড় বিপদ হল গোনাহ প্রকাশ পাওয়া। # বেচা-কেনা বন্ধ করে নামায পড়তে গেলে ব্যবসার ক্ষতি হয় না। বাহ্যিকভাবে ক্ষতি হচ্ছে মনে হলেও নামায ছাড়া যাবে না। # কোন আহলে-দিল যিকিরকারীর পাশে বসলেই নূর পাওয়া যায়। তার চারপাশে নূর ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সে নূরের পরশে আশপাশ আলোকিত হয়ে যায়। তার পাশে উপবেশনকারী সে নূর প্রাপ্ত হয় এবং তার কথা বুঝে আসুক বা না আসুক তার নূরে অন্তর আলোকিত হতে থাকে।

ওফাত

১৪১৬ হিজরীর ২রা যিলক্বদ মোতাবেক ২২ মার্চ ১৯৯৬ ঈসাব্দে শুক্রবার বাদ ফজর আঙ্গুলের সাহায্যে তাসবীহ পাঠ করছিলেন। হঠাৎ তাসবীহ পরিবর্তন করে কালিমা শরীফ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পড়লেন এবং নীরব হয়ে গেলেন। এভাবেই দীর্ঘ আটাশি বছরের বর্ণাঢ্য জীবন শেষে আপন মাওলায়ে কারীমের ডাকে সাড়া দিয়ে যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার মসজিদসংলগ্ন মাকবারায় শায়িত হলেন যামানার অনন্য মুহাদ্দিস মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ ছাহেব রহ.। আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে নূর দ্বারা ভরপুর করে দিন। আ-মীন।

লেখক: শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।
দৌহিত্র, হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ.।

(সোজাপথ ও বাঁকাপথ; ২২ নং পৃষ্ঠার পর)

তার অযোগ্যতা ও অজ্ঞতা বা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অনুপাতে সে অন্যের তাকলীদ করতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে সে যদি কোন মুজতাহিদের তাকলীদ করে তাতে দোষের কিছু নেই। বরং তার জন্য শরীয়তের নির্দেশই হল তাকলীদ করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ...

অর্থ : তোমরা না জানলে অভিজ্ঞদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও। (সূরা নাহল- ৪৩)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

অর্থ : তোমরা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য কর, তাঁর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার দায়িত্বশীলদেরও আনুগত্য কর। (সূরা নিসা- ৫৯)

গাইরে মুজতাহিদের জন্য মুজতাহিদের তাকলীদের মাঝেই রয়েছে শরীয়তের অনুসরণ। এর উদাহরণ হল, কোন ব্যক্তি এমন স্থানে উপস্থিত যে কিবলার দিক নির্ণয় করতে পারছে না। কিন্তু সেখানে এমন লোক উপস্থিত যে কিবলার দিক সম্পর্কে অবগত। এ ক্ষেত্রে অবগত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে নেয়া তার উপর ওয়াজিব।

ইমাম শাতেবী রহ. লিখেন,

أن العالم بالشريعة إذ اتبع في قوله وانقاد إليه الناس في حكمه فإنما اتبع من حيث هو عالم وحاكم بها وحاكم بمقتضاها لا من جهة أخرى فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المبلغ عن الله عز وجل...

অর্থ : শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ আলেমের অনুসরণ ও আনুগত্য এ দৃষ্টিকোণ থেকেই করা হয় যে, তিনি শরীয়ত সম্পর্কে অবগত। শরীয়ত মোতাবেক ও শরীয়তের চাহিদা মোতাবেক সিদ্ধান্ত দাতা। অন্য কোন বিবেচনায় নয়। কেননা আলেম মূলত রাসূলের বার্তা বহনকারী। আর রাসূল হলেন আল্লাহর বার্তা বহনকারী। (আলই'তিসাম; ১০ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৩০)

সারকথা, ইজতিহাদ নির্ভর বিষয়ে শরীয়ত মান্য করার উপায় মাত্র দু'টি। (এক) মুজতাহিদ হলে নিজস্ব ইজতিহাদ অনুযায়ীই আমল করবে। (দুই) মুজতাহিদ না হলে কোন মুজতাহিদের অনুসরণ করবে। কেননা এক্ষেত্রে মুজতাহিদ হল চক্ষুষ্মান। আর অমুজতাহিদ হল দৃষ্টিহীন। চক্ষুষ্মান পথ চলতে অন্যের হাত ধরবে না। আর দৃষ্টিহীন কোন চক্ষুষ্মানের হাত ধরে চলবে। একাকীও চলবে না এবং কোন চক্ষুষ্মানের হাতে হাত রাখেনি এমন অন্ধ লোকের হাতেও হাত রাখবে না। একাকী চললে বা অন্য অন্ধের অনুসরণ করলে নিশ্চিত সে পথ হারাবে। সূরা নিসার ১১৫ নং আয়াতে সাবীলুল মুমিনীনকে অনুসরণ করা, সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে উলুল আমরের আনুগত্য করা, সুনানে ইবনে মাজাহ'র ৩৯৫০ নং হাদীসে 'সাওয়াদে আযম' তথা বড়দলের সঙ্গে থাকা আর হযরত মু'আয ইবনে জাবালের ইজতিহাদ অনুযায়ী চলা এবং সূরা নাহলের ৪৩ নং আয়াতে বিজ্ঞদের জিজ্ঞেস করে চলা উপরোক্ত কথার অকাট্য প্রমাণ। এটাই সোজা পথ, এটাই মুক্তির পথ।

লেখক: নায়েবে মুফতী,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।
খতীব, জাপান গার্ডেন সিটি জামে মসজিদ।

সোজাপথ ও বাঁকাপথ

মুফতী সাঈদ আহমাদ

পূর্ববর্তী দু'পর্বে সীরাতে মুস্তাকীম তথা সোজাপথ ও সোজাপথের দিশারী সম্পর্কে আলোচনার পর এ পর্বে সোজাপথের অনুসারী সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى...

অর্থ : যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও 'সাবীলুল মুমিনীন' তথা মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করবে আমি তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা। (সূরা নিসা- ১১৫)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار.

অর্থ : তোমরা বড় দলের অনুসরণ কর। কেননা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে সে জাহান্নামে গিয়ে পড়বে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩৯৫০)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

إن الله لا يجمع أمتى – أو قال أمة محمد – على ضلالة، ويدالله على الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار.

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে গোমরাহীতে ঐক্যবদ্ধ হতে দিবেন না। জামা'আতের প্রতি আল্লাহর সাহায্য থাকবে। আর যে বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামে গিয়ে পড়বে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২১৬৭)

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, ফিরকায়ে নাজিয়াহ তথা মুক্তিযোগ্য দলের অন্তর্ভুক্ত হবে জামা'আতুল মুসলিমীন ও জামা'আতুল মুসলিমীনের অনুসারীগণ।

ইমাম আবু ইসহাক শাতেবী রহ. তার প্রসিদ্ধ কিতাব *আল ই'তিসাম* এর নবম অধ্যায়ের সপ্তদশ অনুচ্ছেদে এ জামা'আতের যে দীর্ঘ পরিচয় উল্লেখ করেছেন তার সারসংক্ষেপ হল,

'এ জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাহাবায়ে কেরামের জামা'আত। অতঃপর মুজতাহিদ উলামা ও ইমামগণ এবং তাদের অনুসারী সাধারণ মুসলমানগণ। এরাই মুসলমানদের বড় দল। যদিও উলামাদের থেকে বিচ্ছিন্ন লোকের সংখ্যা তাদের চেয়ে বেশি হোক না কেন। সুতরাং যারা মুজতাহিদ উলামা ও তাদের অনুসারীদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে সে মুক্তির যোগ্য বিবেচিত হবে না। বরং হাদীসে পাকের ভাষ্য অনুযায়ী জাহেলিয়াতের উপর মৃত্যুবরণ করবে।

ইমাম আবু মনসূর আল বাগদাদী (মৃত্যু ৪২৯ হি.) *আলফারকু বাইনাল ফিরাক* নামক কিতাবে লিখেন,

فاما الفرقة الثالثة والسبعون فهي أهل السنة والجماعة من فريقى الرأي والحديث دون من يشترى لهو الحديث وفقهاء هذين الفريقين وقراؤهم ومحدثوهم ومتكلمو أهل الحديث منهم كلهم متفقون على مقالة واحدة في توحيد الصانع وصفاته وعدله وحكمته وفي اسمائه وصفاته وفى ابواب النبوة والإمامة وفى احكام العقبى وفى سائر اصول الدين وانما يختلفون في الحلال والحرام من فروع الاحكام وليس بينهم فيما اختلفوا فيه منها تضليل ولا تفسيق وهم الفرقة الناجية.

অর্থ : তেহাত্তর নাম্বার দলটি হল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ। আসহাবুর রায় ও আসহাবুল হাদীস উভয় দল এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে তাঁর নাম ও গুণ বিষয়ে এবং রাসূলের নবুওয়াত ও তাঁর খলীফাগণের বিষয়ে, পরকালের বিশ্বাসে ও দীনের সকল মূলনীতিতে উভয় শ্রেণীর ফকীহ, ক্বারী, মুহাদ্দিস ও আকাইদ বিশেষজ্ঞগণ সকলেই একমত ও অভিন্ন মতাদর্শী। হালাল হারাম ও কিছু প্রাসঙ্গিক বিধি-বিধানে তাদের মতভেদ থাকলেও সে কারণে কখনো একে অপরকে গোমরাহ বা ফাসিক বলে না। এরাই মুক্তিযোগ্য দল। (আলফারকু বাইনাল ফিরাক; পৃষ্ঠা ২৭)

মোটকথা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে আল্লাহ ও তার রাসূলের যে আনুগত্য আবশ্যক এ আনুগত্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ নেই। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল হকপন্থী একই সূত্রে গাঁথা থাকতে হবে। এদের মধ্যে আদর্শগত ও নীতিগত কোন পার্থক্য থাকবে না। মাসআলাগত ও প্রাসঙ্গিক বিধানগত পার্থক্য থাকা দোষনীয় নয়। শর্ত হল সে পার্থক্য ইজতিহাদ নির্ভর হতে হবে।

ইজতিহাদের অর্থ

ইজতিহাদ অর্থ কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত বিধানাবলীতে প্রয়োজনে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নীতি নির্ধারণ। সমসাময়িক ও উদ্ভূত সমস্যাবলীতে কুরআন-সুন্নাহ সম্মত সমাধান প্রণয়ন। শাস্ত্রীয় পরিভাষায় যাকে বলা হয় কিয়াস ও রায়ের অনুসরণ। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি.কে ইয়ামানে পাঠানোর সময়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়ামানে গিয়ে তুমি বিভিন্ন বিষয়ে কীভাবে ফয়সালা করবে? তিনি বললেন, কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কিতাবুল্লাহয় না পেলে? তিনি বললেন, সুন্নাতে রাসূল অনুযায়ী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তাতেও না পেলে? তিনি বললেন, আমি নিজ রায় খাটিয়ে ইজতিহাদ করবো এবং চেষ্টায় ত্রুটি করবো না। এ জবাব শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দনীয় বিষয়ের তাওফীক দিয়েছেন। (সুনানে আবী দাউদ; হা.নং ৩৫৯২, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৩২৭)

দুনিয়াব্যাপী প্রচলিত বিভিন্ন মতাদর্শ সম্পর্কে লিখিত প্রসিদ্ধ কিতাব *আলমিলাল ওয়াননিহাল* এ আল্লামা শাহরাস্তানী (মৃত্যু ৫৪৮ হি.) রহ. লিখেন,

ثم الاجتهاد من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان إذا اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه وأشرفوا على خطر عظيم فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مرتبة على الاجتهاد وترتيب المسبب على السبب كانت الأحكام عاطلة والدرا كلها فائلة فلا بد إذن من مجتهد.

অর্থ : ইজতিহাদ ফরযে আইন নয়। তবে ফরযে কিফায়া। কোন মুজতাহিদ ইজতিহাদ করে নিলে সকলেই দায়মুক্ত হবে। অন্যথায় সকলে গুনাহগার হবে এবং মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। কেননা শরীয়তের ইজতিহাদী বিধানগুলো যখন ইজতিহাদের উপরই নির্ভরশীল তখন ইজতিহাদ না হলে সেগুলো বিলুপ্তি ও বিপর্যয়ের শিকার হবে। সুতরাং মুজতাহিদ আবশ্যক।

এ আলোচনার শেষাংশে তিনি লিখেন,

ثم المجتهدون من ائمة الامة محصورون فى صنفين لايعدوان الى ثالث اصحاب الحديث واصحاب الراى،

اصحاب الحديث وهم اهل الحجاز، هم اصحاب مالك بن انس واصحاب محمد بن ادريس الشافعى واصحاب سفيان الثورى واصحاب احمد بن حنبل واصحاب داود بن على بن محمد الاصفهانى، وانما سموا اصحاب الحديث ...

واصحاب الراى وهم اهل العراق، هم اصحاب ابى حنيفة النعمان بن ثابت ومن اصحابه محمد بن الحسن وابو يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضى... وانما سموا اصحاب الراى ...

অর্থ : মুজতাহিদ ইমামগণ দু'শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ। (এক) আসহাবুল হাদীস তথা আহলুল হিজায; তারা হলেন, ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফেয়ী রহ., সুফিয়ান সাওরী রহ., আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ও দাউদ ইবনে আলী আলইস্পাহানী রহ. প্রমুখ ও তাদের শিষ্যবর্গ।

এরা মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের ধারণ-বহনের কাজ বেশি আঞ্জাম দিয়েছেন এবং কিয়াসের কাজ সাধারণত কম করেছেন। এ কারণে তাদেরকে আসহাবুল হাদীস বলা হয়।

(দুই) আসহাবুর রায় তথা আহলুল ইরাক; তারা হলেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শিষ্যবর্গ অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, কাযী আবু ইউসুফ, ইমাম যুফার, হাসান ইবনে যিয়াদ, ইবনে সামাআহ, কাযী আফিয়াহ, আবু মুতী' বালখী ও বিশর আল মুরাইসী রাহিমাহুমুল্লাহ।

তারা কিয়াস করা, কুরআন-সুন্নাহ হতে আহকাম নির্ণয় করা ও উদ্ভূত সমস্যার সমাধান বের করার কাজ বেশি করেছেন বলে তাদেরকে আসহাবুর রায় বলা হয়। অতঃপর লিখেন, জেনে রাখো! উভয় পক্ষে মাসায়িল সংক্রান্ত বহু মতবিরোধ আছে। এ ব্যাপারে রয়েছে বহু সংকলন-রচনা ও বাহাস-বিতর্ক। এতদসত্ত্বেও কেউ কাউকে কাফের কিংবা গোমরাহ বলেনি। কেননা প্রত্যেক মুজতাহিদের ইজতিহাদই সঠিক। যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। (আলমিলাল ওয়াননিহাল; ১ম খণ্ড ৭ম অধ্যায়)

আল্লামা শাহরাস্তানী রহ. সকল মুজতাহিদের ইজতিহাদই সঠিক বলে ঐ হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে দু'টি সওয়াব পাবেন আর ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছলেও একটি সওয়াব পাবেন।' (সহীহ বুখারী; হা.নং ৭৩৬২)

কারণ ইজতিহাদ নির্ভর বিষয়ে ইজতিহাদ করাই তার দায়িত্ব। কাজেই ইজতিহাদ করল তো তার দায়িত্ব পুরা করে নিল। এর উদাহরণ হল, কোন ব্যক্তি এমন অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হল যে, কিবলার দিক নির্ণয় করতে পারছে না এবং জিজ্ঞাসা করার মতও কাউকে পাচ্ছে না। অপরদিকে নামাযের সময় চলে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে তার জন্য শরীয়তের হুকুম হল, চিন্তা-ভাবনা করে যেদিকে কিবলা হবে মর্মে প্রবল ধারণা হয় সেদিকে মুখ করে নামায পড়ে নেয়া। এতে তার নামায হয়ে যাবে। যদিও বাস্তবে তার ধারণার দিকটি কিবলার দিক না হয়।

মোটকথা, যারা মুজতাহিদ তারা তো ইজতিহাদ নির্ভর বিধানাবলীতে নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করবে। আল্লাহ প্রদত্ত ইজতিহাদী যোগ্যতার কারণে তারা কারো ইজতিহাদ অনুসরণ করবে না। এমনকি অনুসরণ করতেও পারবে না।

তবে মুজতাহিদ হওয়ার জন্য শুধু মেধার প্রখরতা বা দু চারটা বই পড়ে নেয়া যথেষ্ট নয়। এমনকি নিয়মতান্ত্রিক আলেম হয়ে প্রচুর পড়াশোনা করেও অন্যের অনুসরণে বাধ্য হতে হয়। আল্লামা শাহরাস্তানী রহ. লিখেন, ইজতিহাদের জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে,

১. আরবী ভাষা, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য।

২. কুরআনে পাকের তাফসীর ও তাফসীর সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞানে সামগ্রিক অবগতি। কুরআনে বর্ণিত বিধানাবলীর স্তর বিন্যাসের ক্ষমতা।

৩. হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বর্ণনাসূত্রসমূহের সামগ্রিক জ্ঞান তথা গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হাদীস, নির্ভরযোগ্য ও অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী, হাদীসের স্থান কাল ও পাত্র, হাদীসে বর্ণিত বিধানাবলীর শ্রেণীবিন্যাসের যোগ্যতা ইত্যাদি।

৪. সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন ও সালাফে সালেহীন কর্তৃক সমাধাকৃত ও সর্বসম্মত বিধানাবলী সম্পর্কে অবগতি। যেন সে ঐ সকল বিষয়েও ইজতিহাদ করতে শুরু না করে।

৫. কিয়াস ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রসমূহ জানা। কিয়াসের পদ্ধতি ও ভিত্তি সম্পর্কে অবগতি।

এ পাঁচটি শর্ত মুজতাহিদ হওয়ার জন্য জরুরী। যার মধ্যে এ পাঁচটি শর্ত থাকবে না তার ইজতিহাদ অনুসরণযোগ্য নয়। বরং তা পরিত্যক্ত ও অনর্থক। (আলমিলাল ওয়াননিহাল; ৭ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৬২)

বলা বাহুল্য যে, ইজতিহাদের জন্য এ সকল শর্ত সাধারণ জ্ঞানের দাবী। এর জন্য কুরআন-হাদীসের দলীল শর্ত নয়। এসব শর্ত যার মধ্যে নেই সে ইজতিহাদী মাসাইলের ক্ষেত্রে অন্যের অনুসরণ করতে বাধ্য। যাকে পরিভাষায় 'তাকলীদ' বলে। গাইরে মুজতাহিদকে তাকলীদ করতে কারো বলার প্রয়োজন পড়বে না।

(২০ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

এ যু গে র মা সা ই ল

শরয়ী বিধানে প্রাণীর ছবি-২

মাওলানা মাকসূদুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইমাম নববী রহ. বলেন,

قال الزهرى: النهى فى الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هى فيه.

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, সব ধরণের প্রাণীর ছবি নিষেধ। তদ্রূপ যে জিনিসে ছবি থাকে তা ব্যবহার করাও নিষেধ। (শরহে মুসলিম ১৪/৭৬)

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার রহ. (মৃত-৪৬৩হি.) নিজস্ব সনদে লাইস থেকে বর্ণনা করেন,

رأيت سالم بن عبد الله متكئا على وسادة حمراء فيها تماثيل فقلت له في ذلك فقال إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه

নিষিদ্ধ ছবি হলো, যা টানানো হয় কিংবা অঙ্কন করা হয়। অর্থাৎ ছবি আঁকা এবং টানানো উভয়টিই হারাম। (আল-ইসতিযকার ৮/৪৮৭)

ইমাম তৃহাবী রহ. (মৃত- ৩২১হি.) প্রতিকৃতি তৈরি এবং চিত্রাঙ্কনের ব্যাপারে দু'টি মাযহাব উল্লেখ করেন,

فقال قوم قد دخل في ذلك صورة كل شيء مما له روح ومما ليس له روح قالوا لأن الأثر جاء في ذلك مبهما. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما لم يكن له من ذلك روح فلا بأس بتصويره وما كان له روح فهو المنهي عن تصويره واحتجوا في ذلك بما روى عن بن عباس...

এক. উলামায়ে কেরামের কারও কারও মত হল, হাদীস দ্বারা প্রাণী এবং প্রাণহীন উভয় ধরণের ছবি অঙ্কন করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সব ধরণের ছবি আঁকাই হারাম।

দুই. অপর এক জামা'আতের অভিমত হল, হাদীসে হারাম ছবি দ্বারা উদ্দেশ্য প্রাণীর ছবি; প্রাণহীন ছবি অঙ্কনে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

ثم قال: وقد دل على صحة ما قال بن عباس من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله معذبه عليها حتى ينفخ فيها الروح فدل ذلك على أن ما نهى من تصويره هو ما يكون فيه الروح

ইমাম তৃহাবী রহ. বলেন, প্রতিকৃতি তৈরির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকারীর ব্যাপারে ইবনে আব্বাসের হাদীস দ্বারা বোঝা যায় দ্বিতীয় মতটি সহীহ। (শরহু মা'আনিল আসার ৪/৯৮)

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ (রহ.) ছবি অঙ্কনের ব্যাপারে হারাম হওয়ার মত পোষণ করেন।

ইমাম নববী রহ. (মৃত-৬৭৬হি.) *মুসলিম শরীফ*'র ভাষ্যগ্রন্থ *আল-মিনহাজ*-এ চার ইমামের মাযহাব উল্লেখ করেন,

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور فى الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان فى ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو اناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ورحال الابل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فان كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحوذلك مما لايعد ممتهنا فهو حرام وان كان فى بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله ولافرق فى هذا كله بين ماله ظل ومالاظل له هذا تلخيص مذهبنا فى المسألة

প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা সর্বাবস্থায় হারাম। চাই অপদস্থ ছবি হোক বা সম্মানজনক ব্যবহারের জন্য ছবি আঁকা হোক, ছোট হোক কিংবা বড় হোক। এটা হলো ছবি অঙ্কনের হুকুম। আর ব্যবহার বা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হুকুম হল, যদি তা হীন বা তুচ্ছ কোন কাজে ব্যবহার করা হয় তবে তা হারাম হবে না, অন্যথায় হারাম। এরপর ইমাম নববী রহ. বলেন,

وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثورى ومالك وأبى حنيفة وغيرهم

সাহাবা, তাবেঈ এবং পরবর্তী অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত এটাই। ইমাম ছাওরী, ইমাম মালেক, ইমাম আবূ হানীফা রহ. এবং অন্যান্যদের মতও এটাই। (শরহে মুসলিম ১৪/৭৬)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বোঝা গেল, প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা, প্রতিকৃতি তৈরি করা চার ইমামের মতে সর্বাবস্থায় হারাম। তবে ব্যবহার কিংবা নিজের কাছে রাখার ক্ষেত্রে কোনও কোনও সূরত হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার হারাম না হলেও চিত্রাঙ্কন ও প্রতিকৃতি তৈরি সর্বক্ষেত্রেই হারাম।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ. (মৃত-৬৬২হি.) *আত-তাওযীহ* থেকে ইমাম নববী রহ. এর অনুরূপ মাসআলা বর্ণনা করার পর বলেন,

وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم وقال القاضي إلا ما ورد في لعب البنات وكان مالك يكره شراء ذلك

উলামায়ে কেরামের জামা'আত তথা ইমাম মালেক, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবূ হানীফা রহ.এবং অন্যান্যদের মাযহাব এটাই। আল্লামা কাযী ইয়ায বলেন, বাচ্চাদের জন্য তৈরি করা ছবি সদৃশ খেলনা এই হুকুমের আওতাধীন নয়। তবে ইমাম মালেক রহ. ছবি বিশিষ্ট খেলনা ক্রয় করাকেও অপছন্দ করতেন। (উমদাতুল কারী ১৫/১২৫)

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, চারও ইমামের মতে ছবি আঁকা, প্রতিকৃতি তৈরি করা সর্বাবস্থায় হারাম এবং জমহুর উম্মতের মাযহাবও এটাই। কিছু সংখ্যক আহলে ইলম থেকে 'শুধু ছায়া বিশিষ্ট ছবিই হারাম' বলে যে মত বর্ণিত আছে এবং যেটা ইবনে আব্দুল বার রহ.ও উল্লেখ করেছেন– ইমাম নববী রহ. তা বাতিল মাযহাব বলে গণ্য করেছেন এবং বিচ্ছিন্ন মত আখ্যায়িত করেছেন। এ মতের প্রবক্তাদের দলীল এবং তার জবাব ছবি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের হুকুম বর্ণনা করার সময় আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। নিম্নে প্রত্যেক মাযাহাবের স্ব-স্ব কিতাবের বরাত পেশ করা হচ্ছে-

আল্লামা ইবনে আবেদীন হানাফী রহ. বলেন,

لان علة حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى وهي موجودة في كل ما ذكر
ছবি আঁকা হারাম। কারণ ছবি আঁকা হারাম হওয়ার কারণ, 'স্রষ্টার সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করা' সব ধরণের ছবিতেই পাওয়া যায়। (রদ্দুল মুহতার ১/৬৪৭)

আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন,

واعلم ان فعل التصوير حرام مطلقا اى تصوير الحيوان سواء كانت صغيرة اوكبيرة مجسمة اومسطحة ممتهنة اومؤقرة.
প্রাণীর ছবি আঁকা সর্বাবস্থায় হারাম, ছোট হোক কিংবা বড়, আকার আয়তন বিশিষ্ট হোক কিংবা না হোক, অপদস্ত ছবি হোক কিংবা সম্মানজনক স্থানের জন্য তৈরি ছবি হোক। (ফয়যুল বারী ৭/৩৩৫)

শাফেইয়্যাদের মতেও সব ধরণের ছবি আঁকা, প্রতিকৃতি তৈরি করা হারাম। এ ব্যাপারে ইমাম নববী রহ. থেকে উদ্ধৃতি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। শাফেয়ী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার কিতাব *নিহায়াতুল মুহতাজ* (৬/৫৬৩) -এ হুবহু ইমাম নববী রহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

হাম্বলীদের মাযহাবের ব্যাপারে আল্লামা ইবনে কুদামা বলেন,

وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها
প্রাণীর ছবি তৈরি করা হারাম। (আল-মুগনী ১০/২০২)

আল্লামা আলাউদ্দীন মারদাবী রহ. (মৃত-৮৮৫হি.) ফিকহে হাম্বলীর নির্ভরযোগ্য কিতাব *আল-ইনসাফ*-এ লেখেন,

يحرم تصوير ما فيه روح ولايحرم تصوير الشجر ونحوه.
প্রাণীর ছবি আঁকা হারাম। গাছ-গাছালি এবং এ জাতীয় ছবি আঁকা হারাম নয়। (আল-ইনসাফ ফী মা'রিফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ ১/৪৭৪)

সৌদি আরবের ইফতা বোর্ড 'আল-লাজনাতুত দাইমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ' (১/৪৫৭) এর ফতওয়া,

فدل عموم هذه الأحاديث على تحريم تصوير كل ما فيه روح مطلقا، أما ما لا روح فيه من الشجر والبحار والجبال ونحوها فيجوز تصويرها.
ছবির ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসসমূহ এ কথার প্রমাণ বহন করে যে প্রত্যেক প্রাণীর ছবি অঙ্কনই হারাম। তবে প্রাণহীন বস্তু যেমন গাছপালা, পাহাড়-সাগর ইত্যাদির ছবি আঁকা জায়েয।

এতে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম বিন বা'য, আব্দুর রায্যাক আফীফীসহ মুফতী বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরা স্বাক্ষর করেন।

মুফতী শফী রহ. বলেন,

لیکن اصل مسئلہ تصویر کی حرمت کا سب کے نزدیک متفق علیہ ہے
ছবি অঙ্কন হারাম হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। (তাসবীর কে শরঈ আহকাম; পৃষ্ঠা ৫৫)

হামূদ বিন আব্দুল্লাহ আত-তুয়াইজিরী বলেন,

وقد تواترت الادلة على تحريم التصوير.
মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা ছবি অঙ্কন হারাম হওয়া প্রমাণিত। (ই'লানুন নাকীর আলাল মাফতূনীনা বিত-তাসবীর; পৃষ্ঠা ১৬)

যে সকল কারণে প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি করা ও সংরক্ষণ করা হারাম

১. مضاهاة بخلق الله আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য অবলম্বন করা। (আহকামুল কুরআন লি ইবনিল আরাবী ৪/৮) ছবি হারাম হওয়ার বড় কারণ এটাই। পূর্বে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসে এই কারণটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। তবে পাহাড়-পর্বত, গাছ-গাছালি এগুলো যদিও আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। কিন্তু এগুলো অঙ্কন বা চিত্র তৈরি করা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য অবলম্বনের নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না। কারণ এ ধরণের ছবি আঁকা হাদীস দ্বারা অনুমোদিত। তাছাড়া ছবি দ্বারা প্রাণীর ছবিই যে উদ্দেশ্য তা আমরা স্বতন্ত্র শিরোনামে আলোচনা করেছি।

২. كون التصوير وسيلة الى الغلو فى غير الله تعالى بتعظيمه ছবি হলো গাইরুল্লাহর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে বাড়াবাড়ির প্রথম পদক্ষেপ। যার শেষ ফলাফল হল, তা পূজনীয় বস্তুতে পরিণত হওয়া। নূহ সম্প্রদায় এবং তার পূর্ববর্তী কওমে যেমনটি ঘটেছিল। এ কারণেই শরীয়তে মুহাম্মদীতে প্রাণীর চিত্রাঙ্কন, প্রতিকৃতি তৈরি করা সর্বাবস্থায় হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

৩. ان هذه الصور تمنع من دخول الملائكة فى المكان الموجود فيه অসংখ্য হাদীসে এসেছে, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না। তাই উলামায়ে কেরাম এটিকেও ছবি হারাম হওয়ার একটি কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন।

৪. ان التصوير فيه نوع من التشبه باليهود والنصارى وقد نهينا عن التشبه بهم চিত্রাঙ্কন এবং প্রতিকৃতি তৈরি ইয়াহুদী-নাসারাদের স্বভাব। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

لما اشتكى النبى صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضى الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها.
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতার সময় তাঁর জনৈকা স্ত্রী একটি গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। গির্জাটির নাম ছিল মারিয়া। উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা ইতোপূর্বে হাবশায় গিয়েছিলেন। তারা গির্জাটির কারুকাজ ও তাতে বিদ্যমান প্রতিকৃতিসমূহের কথা আলোচনা করলেন... (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৩৪১)

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, গির্জায়, ইবাদতখানায় প্রতিকৃতি তৈরি করা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের স্বভাব ছিল। হাদীসে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

ছায়াবিহীন ছবি আঁকাও হারাম

ছবি আঁকা হারাম হওয়ার ব্যাপারে মালেকী মাযহাবের কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করেছেন, যা সঠিক নয়। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার *আত তাসহীফে* উল্লেখ করেছেন,

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكره من الصور إلا ما له ظل مما له روح من تمثال النحاس والجواهر كلها والطين وكل ما إذا صور كان له ظل
কিছু সংখ্যক আহলে ইলমের অভিমত হল, ছায়াবিশিষ্ট ছবি অঙ্কন করা নিষিদ্ধ।

وذهب غيرهم من أهل العلم إلى أن المكروه من الصور ما كان له روح من كل حيوان من أي شيء صنع كان له ظل أو لم يكن
অন্য সকলের মত হল, সব ধরণের প্রাণীর ছবিই নিষিদ্ধ, চাই তা যেভাবেই বানানো হোক; ছায়াবিশিষ্ট হোক বা না হোক। (আল-ইসতিযকার ৮/৪৮৮)

আত-তামহীদে এই দ্বিতীয় মাযহাবের বর্ণনা এসেছে এভাবে,

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صنعتها واتخاذها ما كان له روح

আহলে ইলমের এক জামা'আতের অভিমত হল, প্রাণীর ছবি আঁকা, প্রতিকৃতি তৈরি করা এবং তা নিজের কাছে রাখা সবই হারাম। (আত-তামহীদ ৮/৫২৮ 'আবুন-নযর মাওলা উমর ইবনে উবাইদুল্লাহ' অধ্যায়)

স্বয়ং ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণিত, ফিকহী মাসাইলের সংকলন *আল-মুদাওওয়ানাতুল কুবরা* (১/১৮২) -তে আছে,

قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن التماثيل وتكون في الأسرة والقباب والمنار وما أشبهها؟ قال: هذا مكروه وقال لأن هذه خلقت خلقا،

ইবনে কাসেম বলেন, আমি মালেক রহ. কে গম্বুজ, মিনার বা উচুঁ স্থানে আঁকা ছবি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, এটা নিষিদ্ধ কাজ। কারণ এ ধরণের কর্মকে ছবি তৈরি বলা হয়।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. *ফাতহুল বারী*তে (১০/৪৭০)এবং আল্লামা যাকারিয়া কান্ধলবী রহ. *আল-কানযুল মুতাওয়ারী*তে (২০/১৭৫) উক্ত মতটি নকল করেছেন। ইবনে নুজাইম রহ. (মৃত-৯৭০হি.) বলেন,

وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان وأنه قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صور الحيوان...

মুসলিম শরীফ'র ভাষ্যগ্রন্থে ইমাম নববী রহ. এর বক্তব্য থেকে বুঝে আসে, প্রাণীর ছবি আঁকা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে... (আল-বাহরুর রায়েক ২/৪৮)

ইমাম নববী রহ. বলেন,

وقال بعض السلف انما ينهى عما كان له ظل ولابأس بالصور التى ليس لها ظل وهذا مذهب باطل فان الستر الذى أنكر النبى صلى الله عليه و سلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل مع باقى الأحاديث المطلقة فى كل صورة

কিছু সংখ্যক সালাফের মত হল, ছায়াবিশিষ্ট ছবি নিষিদ্ধ। আর যে ছবির ছায়া হয় না, তা অঙ্কন করায় শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সমস্যা নেই। (ইমাম নববী রহ. বলেন,) এটা একটা বাতিল মাযহাব। কারণ ছবিযুক্ত পর্দা বিষয়ক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এটা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, ছায়াবিহীন ছবিও নিন্দনীয়। তাছাড়া অন্যান্য মুতলাক (শর্তবিহীন সাধারণ) হাদীসগুলো এর স্বপক্ষে প্রমাণ। (শরহে মুসলিম ১৪/৭৬)

ইবনে হাজার রহ. বলেন, এ মাযহাবকে বাতিল বলার ক্ষেত্রে আরও চিন্তা-ফিকির প্রয়োজন। কারণ এটা মদীনার ফুকাহায়ে সাব'আর মধ্যে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদের মত। তবে এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীস এ মাযহাবটি মারজূহ হওয়ার প্রমাণ বহন করে। (ফাতহুল বারী ১০/৪৭৫)

মালেকী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য আলেম ইমাম ইবনুল আরাবী রহ. (মৃত-৫৪৩হি.) বলেন, ছায়াবিহীন ছবিও হারাম এবং ছবির ক্ষেত্রে এ মতটি অধিক সহীহ। (আরেযাতুল আহওয়াযী ৭/২৫২)

সারকথা, উম্মতের প্রথম যামানা থেকে আজ পর্যন্ত (বিচ্ছিন্ন কিছু মত বাদ দিলে) সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, সব ধরণের ছবি আঁকা হারাম। বর্তমানে আরব এবং হিন্দের সমস্ত মুফতী বোর্ডের ফতোয়া এমনই। শাইখ বিন বা'য, শাইখ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল-উসাইমিন, মুফতী মুহাম্মদ বুখাইত, শাইখ ইউসুফ কারযাভীসহ আরবের উলামায়ে কেরাম নিজ নিজ ফতোয়ায় ছবি আঁকা হারাম হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। উপমহাদেশের আলেমদের মাঝে এ ব্যাপারে কোন যুগেই মতভেদ ছিল না।

আলোকচিত্র (ফটো) এর শরঈ বিধান

ANALOG CAMERA যাকে আরবীতে الالة فوتوغرافية الفلمية বলে। এ ধরণের ক্যামেরা দ্বারা ছবি তোলা প্রায় একশ বছর আগ থেকেই চলে আসছে এবং শতাব্দিকাল ধরেই এ বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা চলে আসছে। এ ধরণের ক্যামেরা দ্বারা ছবি তোলা শরীয়তের দৃষ্টিতে হাতে অঙ্কন করা ছবির মতই হারাম। কারণ প্রাণীর চিত্রাঙ্কন এবং প্রতিকৃতি তৈরি হারাম হওয়ার যে কারণ হাদীসের ভাণ্ডার থেকে উলামায়ে কেরাম চিহ্নিত করেছেন তা এ ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। উদাহরণত একটি কারণ ছিল, স্রষ্টার সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করা। এ ধরণের ক্যামেরা দ্বারা তোলা ছবিতে সুস্পষ্টতই এ কারণ বিদ্যমান। এছাড়া ছবি হারাম হওয়ার যে সকল কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাও এতে পাওয়া যায়। এ ধরণের ছবি হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে দেওবন্দ তথা উলামায়ে হিন্দের কারো দ্বিমত নেই। আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী এবং কংগ্রেসের মাওলানা আবুল কালাম আযাদ রহ. থেকে এ ব্যাপারে জায়েয হওয়ার বক্তব্য পাওয়া গেলেও পরবর্তীতে তারা এ মত থেকে ফিরে আসেন। মুফতী শফী রহ. *তাসবীর কে শরঈ আহকাম* এ তাদের পূর্বের মত ও তা থেকে ফিরে আসার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ছবির ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের উক্তি

মুফতী শফী রহ. বলেন,

حقیقت تو یہ ہے کہ فوٹوگرافی فن تصویر سازی کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے اور تصویر کشی گناہ اس نے آسان اور سستا کرکے ایک وبائی مرض بنادیا ہے۔

প্রকৃতপক্ষে ফটোগ্রাফীর মাধ্যমে ছবি তোলা ছবি আঁকারই আধুনিক পদ্ধতি। এ ধরণের ক্যামেরার আবিষ্কার ছবি আঁকার গুনাহকে আরো সহজ এবং ব্যাপক করে দিয়েছে। (তাসবীর কে শরঈ আহকাম; পৃষ্ঠা ৫৯)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید عالم ہے وہ کہتا ہے کہ تصویر دستی یعنی قلم کی بنی ہوئی کا بنوانا یا مکان میں رکھنا حرام ہے لیکن فوٹو کا لیا جانا اور مکان میں رکھنا حرام نہیں ہے، بدیں دلیل کہ فوٹو آئینہ کا عکس ہے، عام لوگ آئینہ دیکھتے ہیں؟

الجواب: زید کا قول بالکل غلط ہے، اور یہ قیاس مع الفارق ہے، آئینہ کے اندر کوئی انتقاش باقی نہیں رہتا، زوال محاذاۃ کے بعد وہ عکس بھی زائل ہو جاتا ہے، بخلاف فوٹو کے، اور یہ بالکل ظاہر ہے، اور پھر صنعت کے واسطہ سے ہے اسلئے بالکل مثل دستی تصویر کے ہے۔

হযরত থানবী রহ. এর কাছে ফতোয়া চাওয়া হয়েছিল যে, অনেকে ক্যামেরার ছবিকে আয়নার প্রতিবিম্বের সাথে তুলনা করে থাকেন। তিনি বললেন, এটা একেবারে ভুল কথা। এটা قياس مع الفارق (ভুল তুলনা)। কেননা আয়নায় কোন চিত্রই বাকী থাকে না। ব্যক্তির সমান্তরাল অবস্থানের অবসান ঘটলে ছায়ারও বিলোপ ঘটে। অথচ ফটোর ব্যাপারটা এমন নয়। তাছাড়া ছবি কারিগরির মাধ্যমেই প্রস্তুত হয়। এ জন্য অবিকল হাতে বানানো ছবির মতই এর হুকুম। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২৫৩)

সৌদির ইফতা বোর্ড 'আল-লাজনাতুদ দায়েমা' এর ফতোয়া,

لايجوز تصوير ذوات الارواح بالكاميرا وغيرها من آلات التصوير.

وفى موضع "تصوير ذوات الارواح حرام سواء كان تصويرا مجسما اوشمسيا اونقشا بيد اوآلة لعموم ادلة تحريم التصوير".

وفى موضع آخر "التصوير الفوتوغرافى الشمسى من انواع التصوير المحرم".

প্রাণীর ছবি তৈরি করা সর্বাবস্থায়ই হারাম, চাই ক্যামেরার মাধ্যমে করুক কিংবা হাতের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন মেশিনের মাধ্যমে। (আল-লাজনাতুদ দায়েমা ১/৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০)

শাইখ আলী সাবুনী বলেন,

التصوير الشمسى والفوتوغرافى لايخرج عن كونه نوعا من انواع التصوير فما يخرج بالآلة يسمى صورة ... فهو وان كان لايشمله عن نص الصريح لانه ليس تصويرا باليد وليس فيه مضاهاة لخلق الله الا انه لايخرج عن كونه ضربا من ضروب التصوير فينبغى ان يقتصر فى الاباحة على حد الضرورة وما يتحقق به من المصلحة.

ক্যামেরায় তোলা ছবি চিত্রাঙ্কনের প্রকার বহির্ভূত ছবি নয়। সুতরাং যন্ত্রের সাহায্যে যা তৈরি হয় তাকে ছবিই বলা হয়। যদিও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনাগুলো এ ধরণের ছবির ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়নি (তখন এমন ছবি তৈরি হত না) কারণ এ ধরণের ছবি হাতে আঁকা নয়। আর এতে সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয় না। এতদসত্ত্বেও তা চিত্রাঙ্কনেরই একটি প্রকার। এই ধরণের ছবির বৈধতা সত্যিকার প্রয়োজন এবং বিশেষ মাসলেহাত ছাড়া অনুমোদন হয় না। (রাওয়াইউল বায়ান ২/২৯৯)

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. বলেন,

وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي بزعم أنه ليس من عمل الإنسان! وليس من عمله فيه إلا إمساك الظل فقط! كذا زعموا أما ذلك الجهد الجبار...

কিছু লোককে হাতে বানানো ছবি আর ক্যামেরা দ্বারা তোলা ছবির মধ্যে পার্থক্য করতে দেখা যায়। তাদের ধারণা মতে ক্যামেরায় তোলা ছবিতে মানুষের কর্ম অনুপস্থিত। সে সূরতে ছায়া গ্রহণের কাজটিই শুধু মানুষ দ্বারা সংঘটিত হয়। তাদের দৃষ্টিতে এ যন্ত্রের আবিষ্কারকের কঠোর পরিশ্রম -যার ফলেই কয়েক ঘণ্টার কাজ এ যন্ত্রের মাধ্যমেই এক মুহূর্তে করা যায়- কোন কাজই নয়। তদ্রূপ চিত্রকর কর্তৃক ক্যামেরা তাক করা, উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করা এবং এর পূর্বে রিবন ফিট করা পরে ফটো পরিশোধন করা এগুলো তাদের দৃষ্টিতে মানুষের কর্ম নয়। এ পার্থক্যের ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, তাদের নিকট ক্যামেরায় তোলা ছবি ঘরে টানানো বৈধ। আর হাতে আঁকা ছবি বৈধ নয়। পুরনো যামানার কিছু আহলে যাহের ছাড়া এ ধরণের পার্থক্য কেউ করেছে বলে আমার জানা নেই।

আলবানী রহ. আরো বলেন,

...مع أنها تصوير لغة وشرعا وأثرا وضررا

অথচ আভিধানিক, পারিভাষিক, পরিণতি, ক্ষতি এই সব দিক বিচারে ক্যামেরায় তোলা চিত্র ছবির অন্তর্ভুক্ত। (আদাবুয যিফাফ; পৃষ্ঠা ১৯১-১৯৪)

শাইখ মুহাম্মদ আহমদ বলেন,

وما التصوير الفوتوغرافي إلا تطور لمهنة التصوير كما تطورت جميع المهن والصناعات، فالسيارة في الماضي كانت تصنع جميع أجزائها باليد أما الآن فقد حلت المكائن والآلات محل الأيدي...

ফটোগ্রাফী চিত্রাঙ্কনেরই একটি বিবর্তিত আধুনিক পদ্ধতি। সব শিল্পেই উন্নতির ছোঁয়া লেগেছে। এক যামানায় গাড়ী তৈরির জন্য সবকিছুই হাতে করা হত। কিন্তু বর্তমান যামানায় যন্ত্র, মেশিন হস্তকর্মের বিকল্প হিসেবে কাজ করছে। ক্যামেরার ব্যাপারটাও তাই। কাজেই বলা যায় চিত্র তৈরি-পেশার এসব পদ্ধতি চিত্র তৈরির উন্নত পদ্ধতি ভিন্ন কিছু নয়। সুতরাং হাত দ্বারা হোক আর যন্ত্রের মাধ্যমে হোক চিত্র তৈরি সর্বাবস্থায় হারাম। (সানা'আতুস সূরাহ বিল ইয়াদ ১/৩৯, শামেলা সংস্করণ)

হামূদ বিন আব্দুল্লাহ তুওয়াইজিরী বলেন,

أن علة تحريم التصوير هي المضاهاة بخلق الله تعالى ...

وكلما كان التصوير أقرب إلى مشابهة الحيوانات فهو أشد تحريمًا لما فيه من مزيد المضاهاة بخلق الله تعالى...

চিত্রাঙ্কন হারাম হওয়ার কারণ হল, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য অবলম্বন করা। যে ছবি যত নিখুঁত এবং প্রাণীর আকৃতির কাছাকাছি হবে তা ততো শক্ত হারাম। কারণ এতে সাদৃশ্য অবলম্বন বেশী পাওয়া যায়। কারো কাছেই এ বিষয়টি অস্পষ্ট নয় যে, আলোকচিত্র প্রাণীর হুবহু আকৃতির হয়। হাত দ্বারা খচিত ও চিত্রিত ছবি তো কখনও পুরোপুরি মিলে না। (ই'লানুন নাকীর ১/৬৩)

আরব উলামায়ে কেরামের অধিকাংশের মতে ক্যামেরায় ছবি তোলা হারাম এবং সৌদি আরবের জাতীয় মুফতী বোর্ডের সিদ্ধান্তও তাই।

শাইখ ওয়ালিদ ইবনে রাশেদ সাঈদান বলেন,

فمنهم من منعهم وهم الاكثر ... وهذا القول هو الذى عليه الفتاوى فى هذه الديار السعودية.

যারা এমন ছবিকে হারাম মনে করেন তাদের সংখ্যাই বেশি। এ মতের উপর সৌদির উলামায়ে কেরামের ফতওয়া।

ক্যামেরায় তোলা ছবিকে যারা নাজায়েয বলেন তাদের মৌলিক যুক্তিগুলো তুলে ধরা হল

এক. ক্যামেরায় তোলা ছবি যদিও প্রাচীন চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। কিন্তু সামাজিক প্রচলন এবং শরীয়তের পরিভাষায় তা হারাম ছবিরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ عرفا এবং شرعا এগুলো তাসবীর।

দুই. চিত্রাঙ্কন হারাম হওয়ার যে কারণ ছিল مضاهاة بخلق الله (স্রষ্টার সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য অবলম্বন করা) তা ক্যামেরায় তোলা ছবিতে তা পাওয়া যায়। বরং ছবির এ প্রকারে কারণটি হাতে বানানো ছবি থেকেও প্রকটভাবে পাওয়া যায়। সুতরাং এ ধরণের ছবি হাতে বানানো ছবি থেকে কঠিনতর হারাম।

তিন. ক্যামেরায় ছবি তোলা মূলত চিত্রাঙ্কনের আধুনিক পদ্ধতি। সব পেশা এবং শিল্পে উন্নতির ছোঁয়া লেগেছে। (তাই বলে হুকুমে হেরফের হবে না)। কারণ চিত্র তৈরির প্রক্রিয়ায় ভিন্নতা আসা হুকুমে ভিন্নতা আসার কারণ হতে পারে না, যদি সে সূরতেও হারাম বা হালাল হওয়ার মূল কারণটি পাওয়া যায়।

চার. এ প্রকারের ছবিকে হারাম বলার মধ্যেই অধিক সতর্কতা রয়েছে। শরীয়তের মূলনীতি হল, বৈধ-অবৈধ মর্মে মতভেদ দেখা দিলে অবৈধ হওয়াকে প্রাধান্য দেয়া।

যারা ক্যামেরায় ছবি তোলা জায়েয বলেন

মিশরের মুফতী মুহাম্মদ বুখাইত তার গ্রন্থ *আল-জাওয়াবুশ শাফী ফী ইবাহাতিত তাসবীরিল ফটোগ্রাফী*তে লিখেন,

ان اخذ الصورة بالفوتوغرافيا الذى هو عبارة عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لارباب هذه الصناعة ليس من التصوير المنهى عنه فى شيئ لان التصوير المنهى عنه هى ايجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولامصنوعة من قبل ...

ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলা যা মূলত নির্দিষ্ট মাধ্যম দ্বারা ছায়া গ্রহণ করাকে বুঝায়; কোনওভাবেই নিষিদ্ধ চিত্রাঙ্কনের আওতাভুক্ত নয়। কারণ নিষিদ্ধ হল, অস্তিত্বহীন অপ্রস্তুত ছবি অস্তিত্বে আনয়ন করা এবং সূরত প্রস্তুত করা, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি-বৈশিষ্টের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। ক্যামেরা ইত্যাদি দ্বারা ছবি তোলায় এ কারণ পাওয়া যায় না। (আল-হালাল ওয়াল হারাম; কারযাবী, পৃষ্ঠা ১০৪)

আল্লামা ইউসুফ কারযাবী রহ. *আল-হালাল ওয়াল-হারাম* গ্রন্থে এটাই তার মত বলে উল্লেখ করেছেন।

শাইখ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ উসাইমিন বলেন,

واما التقاط التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية التى لاتحتاج الى عمل بيد فان هذا لابأس به لانه لايدخل فى التصوير.

ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি আহরণ করা যে ক্ষেত্রে হাতের কারসাজির প্রয়োজন পড়ে না কোন সমস্যা নেই। কারণ তা তাসবীরের অন্তর্ভুক্ত নয়। (ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম; পৃষ্ঠা ১৭০)

তিনি আরো বলেন,

إن هذا ليس من باب التصوير وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآية فهى انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير والأحاديث الواردة إنما هى فى التصوير الذى يكون بفعل العبد ويضاهى به خلق الله.

এ ধরণের ছবি চিত্রাঙ্কনের মধ্যে পড়ে না, বলা যায়, মাধ্যম ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট সূরত স্থানান্তর করা হয়েছে। সুতরাং এ ধরণের কাজ মুদ্রণের সমার্থক, বান্দার চিত্রাঙ্কনের সমার্থক নয়। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস ঐ সকল তাসবীরের ব্যাপারে যা বান্দার কর্মের মাধ্যমে তৈরি হয় এবং যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি-বৈশিষ্টের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। (ফাতাওয়া শায়খ মুহাম্মদ সালেহ উসাইমিন ১/১৫২)

শায়খ আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক বলেন,

لايزعم الزاعم أن صورة آلة التصويرمضاهاة لخلق الله بل هى انعكاس على الورق أو أى سطح أخر ولا تتدخل القدرة الفنية هنا بكثير أو قليل إلا من حيث إتقان الفنان و وضع الآلة أو توضيحها...

ক্যামেরায় তোলা ছবিতে স্রষ্টার সৃষ্টি-বৈশিষ্টের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয় এ ধারণা ঠিক নয়, বরং এ ধরণের ছবি কাগজ বা প্লেটের উপরে প্রতিবিম্ব ফেলার সমার্থক, এ সূরতে চিত্রাঙ্কনের কোন কিছুই করা হচ্ছে না। হ্যাঁ এতটুকু হচ্ছে যে, নিখুঁতভাবে ক্যামেরা স্থাপনের কাজটি চিত্রকর সম্পন্ন করছে, আর ছবি তোলার কাজ হচ্ছে কাঁচ, লেন্স এবং কিরণের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, এতে মানুষের কোন দখল নেই। (হুকমুত তাসবীর ফিল ইসলাম; পৃষ্ঠা ১৭)

যারা অ্যানালগ ক্যামেরা দ্বারা ফটো তোলা জায়েয বলেন, তাদের যুক্তির সারকথা হল,

এক. ক্যামেরায় তোলা ছবি হাদীসে নিষিদ্ধ ছবির মধ্যে পড়ে না, কারণ এতে না আকৃতি প্রদান করা হয়, না নকশার কাজ করা হয়, আর না চিত্রকর কর্তৃক কোন কাটছাট করা হয়, বরং এতে আকৃতি স্থানান্তর করা হয়। আর ইবাদাত ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল বিধান হল, হালাল হওয়া। তবে হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল থাকলে ভিন্ন কথা।

দুই. এ ধরণের ছবিতে হারাম হওয়ার কারণ مضاهاة لخلق الله পাওয়া যায় না।

যুক্তি খণ্ডন

এক. উলামায়ে কেরাম বলেন, শরাব হাতে বানানো হোক কিংবা মেশিনে উভয় ক্ষেত্রেই হুকুমের মধ্যে কোন পরিবর্তন হবে না। কারণ 'হাতে বানানো' কর্মটি শরাব হারাম হওয়ার কারণ নয়, মূল কারণ হল, নেশা সৃষ্টি হওয়া। সুতরাং যে শরাবে যত বেশি নেশা সৃষ্টি হবে তা ততো কঠিন হারাম। তদ্রূপ ছবি হাতে বানানো হোক কিংবা যন্ত্রের মাধ্যমে যার আকৃতি বানানো হচ্ছে তার সাথে যত সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, হারাম হওয়ার ব্যাপারটা ততো কঠিন হবে। কারণ হারাম হওয়ার কার্যকারণ হল, স্রষ্টার সৃষ্টি-বৈশিষ্টের সাদৃশ্য গ্রহণ করা। 'হাতে বানানো' ছবি হারাম হওয়ার কার্যকারণ নয়। সুতরাং ছবি হাতে বানাক কিংবা যন্ত্রের মাধ্যমে ছবি প্রস্তুতকারী ছবি বানানোর গুনাহে গুনাহগার হবে।

দুই. যারা ক্যামেরায় ছবি তোলা জায়েয হওয়ার মত পোষণ করেন তাদের একটা যুক্তি ছিল পরিকল্পনা প্রণয়ন, আকৃতি গঠন ইত্যাদি কোন কর্ম চিত্রকর কর্তৃক পাওয়া যায় না। গবেষকদের মত হল, চিত্রকরের কোন কর্ম পাওয়া যায় না, এ কথাটি নিতান্তই ভুল, বরং ক্যামেরায় ছবি তোলার ক্ষেত্রে হাতে ছবি অঙ্কনকারীর চেয়েও অধিক কর্ম পাওয়া যায়। (যদিও ছবি হারাম হওয়ার কারণ 'আমল বিল ইয়াদ' নয়)। ক্যামেরা তাক করা, বাটনে চাপ দেয়া, ছবি বের করা, ছবি-শোধন পদার্থে তা সমর্পণ করা ইত্যাদি কাজগুলো চিত্রকর নিজ হাতেই করে। এ সকল কাজ ছাড়া ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি

অস্তিত্বে আসতে পারে না। সুতরাং এ ধরণের অসার যুক্তিতে হারামকে হালাল করার সুযোগ নেই।

তিন. অনেকে ক্যামেরায় তোলা ছবিকে আয়না বা পানিতে প্রকাশ পাওয়া ছায়ার সাথে তুলনা করেন। এ ব্যাপারে ডিজিটাল ফটোর আলোচনায় বিস্তারিত দলীল পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। এখানে শুধু মুফতী শফী রহ. এর আলোচনা তুলে ধরা হল।

آئینہ، پانی وغیرہ کے اندر آئے ہوئے عکس اور فوٹو سے حاصل کی ہوئی تصویر میں زمین وآسمان کا فرق ہے، ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا محض ایک فریب ہے۔

এটা খুব বেশি চিন্তা-ফিকিরের বিষয় নয় যে, আয়না ও পানিতে প্রকাশিত প্রতিবিম্ব আর ক্যামেরায় ধারণ করা ছবির মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য। একটিকে অপরটির উপর তুলনা করা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়।

কথা হল, আয়নায় ছায়া স্থিত হয় না, বরং যার ছায়া তার অনুগামী হয়...

ক্যামেরার আয়নায় যে প্রতিচিত্র আসে তাকে ছায়া ততক্ষণ বলা যাবে, যতক্ষণ তা পদার্থ এবং রং দ্বারা স্থিত না করা হবে। কিন্তু যখনই তা কায়েম এবং স্থিত হয়ে গেল তা ছবি হয়ে গেল। (তাসবীর কে শরঈ আহকাম; পৃষ্ঠা ৫৯, ৬০)

মুফতি তাকী উসমানী বলেন,

والواقع أن التفريق بين الصور المرسومة والصور الشمسية لا ينبنى على أصل قوى ومن المقررشرعا أن ما كان حراما أو غير مشروع فى أصله لايتغير حكمه بتغير الآلة...

বাস্তব কথা হল, অঙ্কিত ছবি আর ক্যামেরায় তোলা ছবির মাঝে পার্থক্য করার ভিত্তি মযবুত কোন দলীলের উপর নয়, শরীয়তসিদ্ধ নীতি হলো, যা প্রকৃতপক্ষে হারাম এবং নিষিদ্ধ, তার হুকুম মাধ্যম পরিবর্তনের দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৪/৯৭)

মুফতি রফি উসমানী ক্যামেরায় তোলা ছবির ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতের সারমর্ম এভাবে তুলে ধরেছেন,

ولكن كثير من علماء البلاد العربية منهم: العلامة الشيخ الألبانى والشيخ مصطفى الحمامى والشيخ الصابونى والشيخ محمد بن أحمد الواصل وغيرهم وجل العماء أو كلهم فى بلاد باكستان والهند والبنغله ديش قد أفتوا بأنه لافرق بين الصور المرسومة يدويا والصور الشمسية الفوتوغرافية فى عدم الجواز أى لا يجوز.

আরবের অসংখ্য আলেম যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শায়খ আলবানী, শায়খ মুস্তফা আল হাম্মামী, শায়খ সাবুনী, শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল ওয়াসেল এবং অন্যান্যরা, তদ্রূপ পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, বাংলাদেশের উলামায়ে কেরামের বৃহদাংশ, বরং বলা যায় সকলেই ফতওয়া দিয়েছেন যে, হাতে আঁকা ছবি আর ক্যামেরায় তোলা ছবির মাঝে কোন পার্থক্য নেই, উভয় ধরণের ছবিই নাজায়েয। (আল মাকালাতুল ফিকহিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ১৬১)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক, শিক্ষার্থী, দারুল ইফতা
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

(৩৩ নং পৃষ্ঠার পর)

স্ত্রীকে প্রবোধ দিয়ে সে ঘুমের ভান করে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করল। বাদ ফজর শ্বশুরকে ফোন করে বলল, আপনার মেয়েকে আপনি এসে নিয়ে যাবেন, নাকি আমি নিয়ে আসবো? শেষ দিনের ঘটনা যেহেতু শ্বশুর তার বড় মেয়ের মাধ্যমে আগেই জেনেছিল। কাজেই জামাইয়ের এমন প্রশ্নের কারণ জানতে চাওয়ার সাহস না দেখিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, বাবারে! তোমার সোনামনির মুখের দিকে তাকিয়ে হলেও আমার মেয়েটাকে মাফ করে দাও। ওর ইউনিভার্সিটি যাওয়া বন্ধ করে দাও। বাচ্চাটাকে নিয়ে যাও, ইত্যাদি, ইত্যাদি। জামাই বলল, বাচ্চাকে দিয়ে যেতে পারেন কিন্তু মেয়েকে অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় আমিই তাকে পৌঁছে দিবো। কয়েকদিন বারবার বলার পরও তাদের তরফ থেকে কেউ না আসায় একদিন সে একটি ট্রাক ভাড়া করে স্ত্রীর বাবার দেয়া সকল আসবাবপত্র তাতে বোঝাই করল। সাথে আরেকটি প্রাইভেটকারও ভাড়া করল। স্বামী-স্ত্রী প্রাইভেটকারে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল আর ট্রাকটিকে তাদের পেছন পেছন যেতে বলল। সামান্য আগে-পরে কার ও ট্রাক শ্বশুরবাড়ির সামনে দাঁড়ালে শ্বশুরকে ফোনে খবর দিয়ে স্ত্রীকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দিল এবং ট্রাকের ভাড়া চুকিয়ে সেই কারযোগেই ঢাকা চলে আসল। এরপর থেকে শাশুড়ী প্রায়ই জামাইকে ফোন দিয়ে 'তোমার ছেলে কথা বলবে' বলে ছেলের হাতে ফোন ধরিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য, তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করা। কিন্তু এ ফোন দিন দিন তার কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে এবং তার মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয়। উত্তরহীন অজস্র প্রশ্নমালা তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়– কেন এমন মেয়েকে বিয়ে করলাম? কেন তাকে ভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ করে দিলাম? কেন বাচ্চাটাকে রাজশাহী রেখে মা-বাবার আদর থেকে বঞ্চিত করলাম? কেন? কেন? আর এ পরিণতির জন্য দায়ী কে? অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এ দেশেই সে আর থাকবে না, জাপান চলে যাবে। আমার সঙ্গে তার যখন কথা, তখন জাপান যাওয়ার ব্যবস্থা প্রায় চূড়ান্ত। তার পেরেশানী শুধু অবুঝ সন্তানটিকে নিয়ে, সে সঙ্গে নিজের অপরাধবোধ তো আছেই। আমি তাকে আল্লাহর রাস্তায় কিছুদিন সময় লাগাতে বললাম। আসলে দীনদারীই হল দুনিয়া-আখেরাতে শান্তির চাবিকাঠি। দীনদারী না থাকলে শান্তি তো দূরের কথা তার সংজ্ঞাও জানা থাকে না। দেশেও না, বিদেশেও না, এমনকি জাপানেও না। আর সাধারণ মানুষের জন্য দীনদারী অর্জনের পরীক্ষিত পন্থা হল, আল্লাহর রাস্তায় তাবলীগ জামা'আতে সময় লাগানো এবং হকপন্থী আলেমগণের পরামর্শে চলা। কারও বিশ্বাস না হলে নিয়ম মেনে আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগিয়ে আলেমদের পরামর্শে চলেন এমন লোকদের জরিপ নিয়ে দেখতে পারেন, তারা কতটা পেরেশানীমুক্ত জীবন যাপন করছে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করুন। আ-মীন।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক: আবূ তামীম

একটি গুরুত্বপূর্ণ ফতওয়া

শরীয়তের দৃষ্টিতে ফেসবুক ব্যবহার

মুফতী মনসূরুল হক

সামাজিক যোগাযোগের অতি জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে ডিজিটাল জগতে আগমন ঘটেছিল ফেসবুকের। কিন্তু ইতোমধ্যে ফেসবুক তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীকে মাদকাসক্তের ন্যায় নেশাগ্রস্ত করে দিয়েছে। সময়ের অপচয়, আড্ডাবাজি, অশ্লীল পত্রালাপ, বেগানা ছেলে-মেয়ের ছবি আদান-প্রদান, বিনা কারণে প্রাণীর ফটো আপলোড করা এবং নাজায়েয প্রেম নিবেদনসহ যাবতীয় অনৈতিক ও অহেতুক কাজে লিপ্ত করা এখন এর বড় অবদান। বখাটে চরিত্র, বিভ্রান্ত চিন্তাধারা প্রকাশের এক অতি সহজ মাধ্যম এ ফেসবুক। এর বিষাক্ত ছোবলে অসংখ্য তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যত বিপন্ন হতে চলেছে। পরকীয়ায় আসক্তির মাধ্যমে সংসার ভাঙ্গতে শুরু করেছে বহু দম্পতির। অশ্লীল কিংবা পরপুরুষ ও পরনারীর ছবি দেখা ছাড়া অহেতুক সময়ের অপচয় বাদ দিয়ে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা যখন শতকরা একজনও নয় তখন ইসলামী শরীয়া মতে ফেসবুক ও এ জাতীয় যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার জায়েয হতে পারে না। কারণ এতে উপকারের তুলনায় অপকার অনেক বেশি এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার রয়েছে পরিপূর্ণ ঝুঁকি। বৈধ যতটুকু ব্যবহার সম্ভব তার জন্য রয়েছে এর চেয়ে নিরাপদ বিকল্প। এ অবস্থায় শরীয়তের কোনো মূলনীতিই যোগাযোগের এ মাধ্যম ব্যবহারের বৈধতা দান করে না।

কারো কারো ধারণায় বৈধ উপায়ে ফেসবুক ব্যবহার করে অতি সহজে অসংখ্য লোকের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছানো যায়। তাদের ধারণা সঠিক হলে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর অজুহাতে বর্তমান টেলিভিশনকে ফেসবুকের চেয়েও অধিক কার্যকর মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করতে হয়। অথচ বিবেক ঠিক থাকলে কেউ এমনটা বলতে পারবে না। আজ পর্যন্ত কোন হক্কানী আলেম বা মুফতী টিভির মাধ্যমে দীন প্রচারকে জায়েয ফতওয়া দেননি।

কারো কারো দাবী, ফেসবুক ব্যবহার করলে নাস্তিক-বদমায়েশদের হাত দিয়ে যে মল-মূত্র নির্গত হয় সে সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়। তাদের এ দাবী গ্রহণযোগ্য হলে কিছু দীনদার লোককে সিনেমা দেখার অনুমতি দিতে হয়(?) কেননা সিনেমার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বর্তমানে আরো বেশি হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। তার প্রতিরোধে দীনদার কোন লোককে সিনেমা হলে গিয়ে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে বা দর্শকদেরকে তিন চিল্লার দাওয়াত দিতে সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে? কখনও নয়।

কিছু অবিবেচক ফেসবুকের ব্যবহারকে দৈনিক পত্রিকা পড়ার সাথে তুলনা করতে চেষ্টা করে। অথচ পত্রিকায় যখন-তখন ছবি আপলোড করার সুযোগ নেই। পত্রিকার মাধ্যমে যার তার সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ার সুবিধা নেই। সহজে ফ্রেন্ড সার্কেল তৈরি করে রাত-বিরাতে আড্ডা দেয়ার ব্যবস্থা নেই। অশ্লীলতা ও অনৈতিকতা পত্রিকার মূল প্রতিপাদ্য নয়। এতগুলো পার্থক্য থাকাবস্থায় ফেসবুককে দৈনিক পত্রিকার সাথে তুলনা করা মোটেও সঠিক নয়।

মোটকথা, লাভ-ক্ষতি উভয়টি একত্রিত হলে শরীয়তের মূলনীতিতে ক্ষতির দিকটি প্রাধান্য পায়। শরয়ী প্রয়োজন না থাকলে গুনাহের ঝুঁকি তৈরি করে এমন বস্তুও পরিত্যাগ করতে হয়। কুরআন-হাদীসে অনুল্লেখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত সর্বসাধারণের ব্যবহারের ভিত্তিতে বৈধ-অবৈধ বিবেচিত হয়। গুনাহের পথ বন্ধ করার স্বার্থে গুনাহের মাধ্যমকেও বন্ধ করা আবশ্যক। শরীয়তের স্পষ্ট এ সকল মূলনীতির আলোকে বর্তমান ফেসবুক ও এ জাতীয় গণমাধ্যমের ব্যবহার নাজায়েয ও হারাম। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলা জায়েয হবে না। আর যারা না জেনে এ যাবত ব্যবহার করেছে তাদের জন্য এ অপশন বন্ধ করে অতীতের জন্য তওবা করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে গুনাহমুক্ত যিন্দেগী নসীব করেন। আমীন।

সূত্রসমূহ:

(١) عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وإن لكل ملك حمى الا وإن حمى الله محارمه. (سبل السلام : ١٣٨١)

(٢) عن ابن مسعود أنه قال ما جتمع الحرام والحلال الا غلب الحرام على الحلال. (سنن البيهقى الكبرى : ١٣٧٤٧ المكتبة الشاملة)

(٣) عن ابى امامة عن النبى صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يغض بصره الا احدث الله له عبادة يجد حلاوتها. (مسند احمد : ٢٢٣٣٢ [مجمع الزوائد ٦٣ المكتبة الشاملة])

(٤) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتى ابدلته ايمانا يجد له حلاوته فى قلبه. (كنز العمال : ١٣٠٦٨ المكتبة الشاملة)

(٥) عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسن اسلام المرأة تركه ما لا يعنيه. (سنن الترمذى : ٢٣١٧)

(٦) اذا تعارضا مفسدتان روعى اعظمها ضررا بارتكاب اخفها. (المجلة : ماده– ٢٨)

(٧) واعلم ان ما يتعلق بسد الذرائع ينقسم الى ثلاثة أقسام: (١) ذرائع أجمع العلماء على سدها وهى الذرائع المؤدبة الى الفساد والخلل فى اعور الدين والدنيا. (المعاملات المالية المعاصرة ١٤/١)

(٨) وضابط منع الذريعة ان تكون فيه شانها الإفضاء الى المفسدة لا محالة [قطعا] اوكثيرا او تكون مفسدة الفعل ارجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة. (الفقه الاسلامى ٥٢٥٨/٧)

(٩) الذريعة هى المسألة التى ظاهرها الإباحة ويتوصل بها الى فعل المحظور. (ارشاد الفحول ٢٨١/٢)

আলোক মিনার

পাহাড়ী হুযূর দামাত বারাকাতুহুম

বিনয় ও দুনিয়া বিমুখতার জীবন্ত পাঠশালা

মাওলানা আব্দুল হামীদ খুলনাবী

পরশ পাথরের সংস্পর্শে পাথর যেমন সোনা হয়ে যায়, তেমনি যুগে যুগে আহলুল্লাহদের সোহবতে বহু মাটির মানুষ স্বর্ণমানবে রূপান্তরিত হয়েছেন। এমনই একজন পরশপাথর ছিলেন মুসলিম উম্মাহর আধ্যাত্মিক রাহবার, বিশ্বনন্দিত হাদীস বিশারদ, কুতবুল আলম হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া কান্ধলবী রহ.। যার সান্নিধ্যে এসে সোনায় পরিণত হয়েছেন পাক-ভারত-বাংলাসহ মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য উলামায়ে কেরাম। পাহাড়ী হুযূর হযরত যুবায়ের চাটগামী দা.বা. তাদেরই একজন। তিনি হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর বিশিষ্ট শাগরেদ, খাস খাদেম এবং প্রথম সারির খলীফা। তিনি বাংলাদেশে দাওয়াত ও তাবলীগের শুরু যুগের অন্যতম অভিভাবক। কাকরাইলের বর্তমান মুরব্বীগণ সকলেই তার শিষ্য পর্যায়ের। চট্টগ্রাম মারকায লাভলেইন মসজিদ তারই প্রতিষ্ঠিত। ইখলাস ও সরলতার তিনি এক জ্বলন্ত নমুনা।

হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এর সঙ্গে মুসাফাহা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সেখানকার লোকদের মুখে পাহাড়ী হুযূরের অনেক আলোচনা শুনেছি। ১৯৭৯ সনে আমি মেখল মাদরাসায় নাহবেমীর পড়ি। তখন লাভলেইন মারকাযে প্রথম দেখা হয়। নূরানী চেহারা, হালকা পাতলা গড়ন, সাদাসিধে পোশাক-পরিচ্ছদ। দেখলে মনে হয় সাধারণ একজন মানুষ। তবে সবর, ইখলাস ও ইনাবাত ইলাল্লাহর মূর্তপ্রতীক। তার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সব সময় সফরে থাকেন; নির্দিষ্ট কোন স্থানে পাওয়া যায় না। সেই যে দেখা হল আর কোন খবর নেই। কোথায় আছেন? আজ শুনি এখানে তো দু'দিন পর অন্য কোথাও চলে গেছেন। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম তার কথা। ছয় সাত বছর আগে হঠাৎ এক ভাই এসে বললেন, জামি'আ রাহমানিয়ার অফিসে এক বুযুর্গ এসেছেন। শাইখ যাকারিয়া রহ. এর খাস খাদেম ও খলীফা। জিজ্ঞেস করলাম, মাওলানা যুবায়ের চাটগামী সাহেব? বললেন, হ্যাঁ। মনে পড়ল শৈশবের সেই স্মৃতি। দৌড়ে গেলাম। দেখি গ্রামের সাধারণ মানুষের মত পরনে লুঙ্গি, গায়ে পুরাতন একটি ফতুয়া, বয়সের ভারে ন্যুব্জ এক বৃদ্ধ। ৩০ বছর পর দ্বিতীয়বার দেখে অবাক হলাম। কুতুবে আলমের সংস্পর্শধন্য পরিচয় বিমুখ এক মহান বুযুর্গ এখন আমার সামনে। আবেগে ভেতরটা কেমন করে উঠল। জানতে পারলাম, বারিধারায় প্রতি শুক্রবারে ইসলাহী মজলিস করেন। এদিকে হযরত ওয়ালা হারদুঈ রহ. এর সঙ্গে আমার ইসলাহী সম্পর্ক ছিল। হযরতের ইন্তিকালের পর কার দিকে রুজু করব ভাবছিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, এই বুযুর্গের সঙ্গেই সম্পর্ক গড়ব। নিয়মিত যাতায়াত শুরু করলাম। দূর পাল্লার সফরেও সাথে থাকার সুযোগ হয়েছে। রাবেতার দায়িত্বশীলদের অনুরোধে তার বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন ও ইখলাস পূর্ণ দীনী খিদমত সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করা হল।

জন্ম : ওলি-আল্লাহর স্মৃতিধন্য চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার চেটুরিয়া গ্রামে আনুমানিক ১৯২০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম সৈয়দ আহমদ ছিলেন একজন মুখলিস দীনদার মানুষ। বার্মায় ব্যবসা করতেন। সন্তান হওয়ার পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলেন তাকে আলেম বানাবেন। নামও নির্ধারণ করা ছিল। পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদে আনন্দে আত্মহারা পিতা বলে উঠলেন, 'মৌলবী সাব আসছে'।

ছাত্রজীবন : ১৯৪০ সনে বাঁশখালী কৈগ্রাম মাদরাসায় নাহবেমীর পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তারপর হাটহাজারী মাদরাসায় হেদায়া পর্যন্ত পড়েন। অতঃপর ভারতের রিয়াসাত রামপুর মাতলাউল উলূম মাদরাসায় জালালাইন-মিশকাত পড়েন। সর্বশেষ সাহারানপুর মাদরাসা হতে দাওরায়ে হাদীস ফারেগ হন।

কুতবুল আলমের সান্নিধ্যে : বুখারী পড়েন শাইখ যাকারিয়া রহ. এর নিকট। জগৎজোড়া যার সুনাম সুখ্যাতি সেই মহান বুযুর্গের সান্নিধ্য লাভ করা, আস্থাভাজন ও তবীয়ত-শেনাস হতে পারা সোনার হরিণ বৈকি? দরসে হাদীসের মাধ্যমে নৈকট্য লাভের সুযোগ লাভ করেন। একদিন শাইখের কাছে বাইয়াত হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে শাইখ বললেন, ইস্তেখারা করে বাংলাদেশী কোন বুযুর্গের হাতে বাইয়াত হন। তিনি বললেন, ইস্তেখারা করেই আপনার কাছে এসেছি, ফিরে যেতে পারব না। অগত্যা শাইখ তাকে বাইয়াত করেন এবং নিজের ঘরের খাস খাদেম বানিয়ে নেন। বাসার বাজার করা, লাকড়ী সংগ্রহ করাসহ যাবতীয় খিদমতের জন্য আম্মাজান মৌলবী যুবায়ের চাটগামীকে ডাকতেন। শাইখের একমাত্র ছেলে মাওলানা তলহা সাহেব তখন হিফয পড়তেন। শাইখের অভ্যাস ছিল মেহমান ছাড়া খানা খেতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন আমি রিযিক পাওয়ার যোগ্য নই, মেহমানের ওসীলায় আল্লাহ তা'আলা আমাকে রিযিক দেন। একদিনের ঘটনা। শাইখ মেহমানের প্রতীক্ষায় ছিলেন। মাওলানা তলহা সাহেব বললেন, যুবায়ের সাহেব তো আছেন; তাকে মেহমান বানিয়ে নিন। শাইখ উত্তর দিলেন, وہ تھوڑائی مہمان ہے، وہ تو ہمارا گھر کا آدمی ہے (সে মেহমান হবে কেন? সে তো আমাদের ঘরের মানুষ)।

কর্মজীবন : দাওরায়ে হাদীস শেষ করে শাইখের পরামর্শে রমাযানে নিযামুদ্দীন ই'তিকাফ করেন। এরপর তাবলীগে একসাল সময় লাগান।

এরপর আরেক সাল লাগান। অতঃপর একমাস নিযামুদ্দীনে আর একমাস সাহারানপুরে শাইখের খিদমতে অতিবাহিত করতে থাকেন। শাইখের দরবারে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম বাঙ্গালী।

বাংলাদেশে দাওয়াত ও তাবলীগের পথিকৃৎ : সাল চলাকালীন হযরতজী ইউসুফ সাহেব রহ. তাকে বিদেশী জামা'আত দিয়ে বাংলাদেশে পাঠালেন। ঢাকার কোথাও জামা'আত নিয়ে ওঠার জায়গা হল না। চলে গেলেন চট্টগ্রামে। সেখানে দাওয়াতী কাজের গোড়াপত্তন হল। বিশ্ব ইজতেমাও সেখানে অনুষ্ঠিত হত। দুই সাল শেষ হলে শাইখ তাকে স্থায়ীভাবে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। প্রথম মারকায বন্ধ হয়ে গেল। বাড়িতে এসে মক্তব কায়েম করলেন এবং চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী শোলকবহর মাদরাসাও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন, যা এখন দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত চলছে।

চট্টগ্রামের বর্তমান মারকায ঐতিহাসিক লাভলেইন মসজিদ এক সময় জঙ্গল ছিল। মানুষ সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলত। পরবর্তীতে যখন মারকাযের ব্যবস্থা হল তখন তিনি নিজ হাতে সেই জঙ্গল পরিষ্কার করেছেন। যা আজ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মারকায।

খেলাফত লাভ : ২৫ বছর যাবত তিনি প্রতি বছর শাইখের দরবারে যেতেন। ১৯৬১ সনে খেলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি শাইখের ৬ষ্ঠ খলীফা।

একবার শাইখ চট্টগ্রামে তার কাছে চিঠি পাঠালেন, তুমি জিদ্দায় আসো। চিঠি পেয়ে তিনি নৌজাহাজে জিদ্দায় গেলেন। এরপর শাইখের সঙ্গে একসাথে হজ্জ পালন করলেন।

আজব খাদেম : মক্কায় শাইখ মাদরাসায়ে ছাওলাতিয়ায় অবস্থান করতেন। একদিন শাইখের ভীষণ জ্বর হল। হাকীম-কবিরাজ ডাকা হল, আরো কত কি। কিন্তু জ্বর পড়ছে না। শাইখের সফরসঙ্গী হিন্দুস্তানী একলোক বললেন, শাইখের মেযাজ-তবীয়ত বোঝেন এমন একজন বাঙ্গালী খাদেম আছেন, নাম যুবায়ের চাটগামী; তাকে ডাকেন। সে হয়তো বুঝবে এখন কী করতে হবে। ছাওলাতিয়ার মুহতামিম সাহেব খুব পেরেশান। যুবায়ের সাহেবকে ডাকা হল। তিনি বললেন, আমার কথা তো আপনাদের বোধগম্য হবে না। মুহতামিম সাহেব রেগে গেলেন। বললেন, কেন হবে না! আপনি বলুন। তিনি বললেন, কুতুবখানার চাবি আনেন। সবাই বলল, জ্বরের সাথে চাবির কী সম্পর্ক? তিনি বললেন, সেটাই তো বলেছিলাম, আপনাদের বোধগম্য হবে না। যা হোক চাবি আনা হল। তিনি কুতুবখানায় প্রবেশ করে শাইখের মুতালা'আর বিভিন্ন কিতাব তিন দিক দিয়ে টেবিলে সাজিয়ে শাইখকে মাঝখানে এনে বসিয়ে দিলেন, সঙ্গে কয়েক খিলি পানও দিলেন। তখন শাইখ বললেন, تو نے سمجھا (তুমিই ধরতে পেরেছো)। পান মুখে দিয়ে মুতালা'আ আরম্ভ করলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর শরীর ঘামতে লাগল, জ্বর চলে গেল। সবাইকে অবাক করে দিলেন এই বাঙ্গালী খাদেম।

একবার তিনি হযরতজী ইউসুফ রহ. এর সঙ্গে উমরা করছিলেন। জিইররানাতে বসে চিন্তা করছিলেন, এখনও দু'টি উমরা বাকী- একটি পিতার নামে, আরেকটি শাইখের মাতার নামে। হঠাৎ তিনি যেন প্রত্যক্ষ করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছেন, এদেরকে বাদ দিয়ে আমার নামে উমরা কর। তিনি তাই করলেন।

পাহাড়ী হুযূর : পাহাড়ীদের মধ্যে দীন প্রচার ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লোকালয় ছেড়ে দীর্ঘদিন তিনি পাহাড়ে কাটিয়েছেন। থাকতেন পাহাড়ীদের সাথেই। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় সফরে যেতেন। এজন্য তিনি পাহাড়ী হুযূর নামে প্রসিদ্ধ।

নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন আজীবন : সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তার অসংখ্য ভক্ত মুরীদান রয়েছে। তিনি প্রতি মাসে চট্টগ্রাম, বান্দরবান, কক্সবাজার, নিলফামারী, খুলনায় নিয়মিত সফর করতেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও বাসে চেপে বিভিন্ন জেলায় চলে যান। বিভিন্ন মাদরাসায় যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করেন। পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া দেখে অনেক স্থানে কেউ জানতেও চায়নি তিনি কে, কেন এসেছেন। উলামাদের অনেক মজলিসেও তাকে যেতে বাধা দেয়া হয়েছে। তবুও কখনও আগে বেড়ে নিজের পরিচয় দেননি। তবে যারা তাকে চিনতে পারে তাদের কদরে কোন সময়ই কমতি ছিল না।

ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসার কোন জায়গা ছিল না। গত চার পাঁচ বছর আগে এক ভাই সাভার বাসস্ট্যান্ড হতে বিশ মাইল ভিতরের এক গ্রামে একটি জায়গার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। যাতায়াত ব্যবস্থা সুবিধাজনক নয়। নিভৃত পল্লী, চারিদিকে বাগান, আশপাশে বসতি নেই, সেখানে ছোট্ট একটি ঝুপড়িতে তিনি থাকেন। প্রতিমাসে সেখানে ইসলাহী মজলিস হয়। ঢাকার বড় বড় উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মানুষ সেখানে নিয়মিত যাতায়াত করেন।

মুসতাজাবুদ্দাওয়াহ বুযুর্গ : হুযূরের একজন খাস ভক্ত পুরান ঢাকার বাসিন্দা মানিক ভাই ফোন করে একটি ঘটনা শুনালেন। সপ্তাহ খানেক আগে তিনি একটি বিপদে পড়েছিলেন। শত্রুপক্ষ অসৎ কোন উদ্দেশ্যে তাকে পরদিন দেখা করতে বলেছে। তিনি ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। সারারাত ঘুম হয়নি। নামাযে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। পেরেশানীতে তাও পারছেন না। রাত ২টা। হঠাৎ দেখেন তার মোবাইলে পাহাড়ী হুযূরের কল। তিনি অবাক হলেন, হুযূর তো এখন বান্দরবানে আছেন, আর পাহাড়ে নেটওয়ার্ক নেই। তাছাড়া তিনি মোবাইল ব্যবহার করতে পারেন না। তাছাড়া এত রাতেই বা ফোন করবেন কেন! যা হোক, তিনি ফোন রিসিভ করতেই শুনতে পেলেন, হুযূর হাসছেন আর বলছেন, তুমি বিপদে আছ বুঝি? তিনি পেরেশানীর কথা জানালে হুযূর বললেন, আগামীকাল আমি বারিধারায় আসবো, তুমি দেখা কর। পরদিন তিনি দেখা করলেন। হুযূর তাকে একটি আয়াত লিখে দিয়ে বললেন, ওদের সামনে গিয়ে এটা পড়বে। তিনি তাই করলেন। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে কেন ডেকেছেন? দেখেন, তাদের আচরণ সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা হেসে হেসে বলছে, অনেকদিন দেখা হয়

না, ভেবেছি আজ একসাথে দুটো খাব তাই আসতে বলেছি।

এ জাতীয় অসংখ্য কারামত ও খেলাফে আদত ঘটনা তার থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

সন্তানাদি ও খলীফাবৃন্দ : হুযূরের চার পুত্র। সকলেই বিভিন্ন স্থানে দীনের খিদমতে রত আছেন। দ্বিতীয় পুত্র উবাইদুল্লাহ সাহেব হুযূরের সাথেই খানকাতে থাকেন। বাকিরা চট্টগ্রামে থাকেন। এ পর্যন্ত হুযূর ১১/১২ জনকে খেলাফত প্রদান করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, মাওলানা গোলাম কাদের সাতকানিয়া, মাওলানা আব্দুল হামীদ খুলনা, মাওলানা আবুল কাসেম গোপালগঞ্জ, মাওলানা ইমদাদুল্লাহ কক্সবাজার প্রমুখ।

আল্লাহ তা'আলা হযরতকে সুস্থতার সাথে নেক হায়াত দান করুন। তার সকল খেদমতকে কবুল করে জারী রাখুন। আমাদেরকে তার থেকে আরো বেশি বেশি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক, প্রবীণ মুহাদ্দিস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া ঢাকা।

(মুহাররম ও আশুরা ৩৭ নং পৃষ্ঠার পর)

(৪) কোন কোন বর্ণনায় আশুরার দিনে পরিবার-পরিজনের জন্য উদার মনে ব্যয় করার ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه في سائر سنته

অর্থ : যে ব্যক্তি আশুরার দিন তার পরিবার-পরিজনের খোর-পোষে প্রশস্ততা অবলম্বন করবে আল্লাহ তা'আলা সারা বছর তাকে প্রশস্ত রিযিক দান করবেন। (শুআ'বুল ঈমান; হা.নং ৩৭২৯)

মুহাররম মাসের ফযীলতের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি, আশুরার ফযীলত শুধুমাত্র সাইয়িদুনা হযরত হুসাইন রা. এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে নয় এবং নয় শুধু শোক-সন্তাপের। বরং আশুরা হল, আনন্দ ও শোকের যুগপৎ সম্মিলন, যার মধ্যে আনন্দের ভাগই বেশী। তাছাড়া স্বামী ব্যতীত অন্য কারও মৃত্যু বা শাহাদাতে কোন মুসলমানের তিন দিনের অধিক শোক পালন করা অনুমোদিত নয়। এজন্য হযরত হুসাইন রা. এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে এ দিনটি শোকের আবহে পালন করা শরীয়ত-সমর্থিত নয়। তবে তার শাহাদাত যেহেতু নিঃসন্দেহে একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা তাই বেশি বেশি দু'আ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তার শাহাদাতকে শ্রেষ্ঠ মরতবা দান করুন এবং আমাদেরকেও তার মত ন্যায় প্রতিষ্ঠার জিহাদে নির্ভীক হওয়ার তাওফীক দান করুন।

কতিপয় বর্জনীয়

(ক) মুহাররম মাসকে শোকের মাস মনে করা। (খ) অশুভ মনে করে এ মাসে নতুন কাজ বিশেষত বিবাহ-শাদী না করা। (গ) তাযিয়া মিছিল বের করা ও এ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে শরীক হওয়া। (ঘ) হায় হাসান! হায় হোসেন! বলে মাতম করা। ছুরি-চাকু দিয়ে নিজের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করা। (ঙ) শোকগাথা বর্ণনা করা। (চ) শোক পালনের উদ্দেশ্যে কালো কাপড় পরা কিংবা মাথায় কালো ক্যাপ বা ফেটি বাধা। (ছ) এ দিন উপলক্ষে শরবত পান করানো বা খিচুড়ি বিতরণ করা। ইত্যাদি, ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে করণীয়গুলো করার ও বর্জনীয়গুলো বর্জন করার তাওফীক দান করুন।

লেখক: সিনিয়র মুহাদ্দিস; তত্ত্বাবধায়ক, তাফসীর বিভাগ: জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

(ফাতাওয়া মাসাইল; ৪৩ নং পৃষ্ঠার পর)

এখন প্রশ্ন হল, আমার ভাই কি হাকীকী শহীদ বলে গণ্য হবেন? এ ধরণের শহীদকে গোসল এবং কাফন পরাতে হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী আপনার ভাই হাকীকী শহীদ বলে গণ্য হবেন। শর্ত হল, জানাবাতের অবস্থায় মৃত্যু না হওয়া। সুতরাং তাকে গোসল দিতে হবে না এবং তাকে তার শহীদ হওয়ার সময়ে পরিধেয় রক্ত মাখা কাপড় দিয়ে কাফন দিতে হবে।

উল্লেখ্য, তার উপর তখন যদি গোসল ফরয থেকে থাকে, তাহলে তাকে গোসল দিবে এবং তার শরীরে রক্ত ছাড়া অন্য কোনো নাপাক লেগে থাকলে তা ধুয়ে দিবে।

الشهيد هو من قتله أهل الحرب أوالبغي أوقطاع الطريق أووجد في المعركة وبه أثر أوقتله مسلم ظلما، ولم يجب بقتله دية بيان لشرائطه، قيد بكونه مقتولا؛ لأنه لو مات حتف أنفه أوتردى من موضع أواحترق بالنار أومات تحت هدم أوغرق لا يكون شهيدا أي في حكم الدنيا وإلا فقد {شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للغريق وللحريق والمبطون والغريب بأنهم شهداء} فينالون ثواب الشهداء كذا في البدائع، وفي التجنيس رجل قصد العدو ليضربه فأخطأ فأصاب نفسه فمات يغسل؛ لأنه ما صار مقتولا بفعل مضاف إلى العدو ولكنه شهيد فيما ينال من الثواب في الآخرة؛ لأنه قصد العدو لا نفسه.

(আল বাহরুর রায়েক ২/৩৪৩, রদ্দুল মুহতার ২/২৪৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৩/৪৫৯)

মাহবুব আলম
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

৫৪ প্রশ্ন : বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। যেমন শাহ জালাল ইসলামী ব্যাংক, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক ইত্যাদি। এসব ব্যাংকে চাকুরী করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? এখানে চাকুরী করে যা উপার্জন করা হবে তা হালাল হবে কি না?

উত্তর : কোনো ব্যাংক যদি শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে কারবার করে তাহলে সে ব্যাংকে চাকুরী করা জায়েয এবং সে চাকুরীর উপার্জনও হালাল। আর যদি শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে কাজ না করে, তাহলে সে ব্যাংক সুদী ব্যাংক হয়ে যাবে। সুদী ব্যাংকে এমন চাকুরী হারাম যা সরাসরি সুদের সাথে সম্পৃক্ত। যে সব কাজ-কর্ম সুদের সাথে সম্পৃক্ত নয় যেমন ব্যাংকের ড্রাইভারী, দারোয়ানী এবং এ জাতীয় অন্যান্য চাকুরী করা জায়েয হবে তবে অনুত্তম।

বি.দ্র. আমাদের জানা মতে বাংলাদেশের কোনো ইসলামী ব্যাংকই পরিপূর্ণ সুদমুক্ত নয়। তাই ব্যাংকে চাকুরীর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। (সূরা বাকারা ২৪৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৩০২১, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ১/৩৮৮)

পা নি ন য় ! ম রী চি কা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-৩

সু-স্বাস্থের অধিকারী এক নওজোয়ান। একদিন কিছু সময় চেয়ে আমার লাইব্রেরীতে আসল। সালাম-মুসাফাহার পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পাশে বসল। এ বয়সী ছেলেদের কাউকে এমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আমি কখনও দেখিনি। বর্তমান বাসার ঠিকানা বলে গ্রামের বাড়ী জানাল– রাজশাহী। শিক্ষিত মানুষ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাব বিজ্ঞানে এম.এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথা অনুযায়ী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার কথা। নিয়োগ নিশ্চিত করতে বিয়ে করেছে এক প্রোভস্টের কন্যাকে। দুর্ভাগ্য বশত প্রোভস্টের পার্টি ইতোমধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসতে ব্যর্থ হয়েছে। যে কারণে জামাইবাবুর নিয়োগপ্রাপ্তির স্বাভাবিক আশাও হতাশায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রতীক্ষার প্রহর গোনা বাদ দিয়ে জামাই চাকুরি নিয়েছে মার্কেন্টাইল ব্যাংকে। ইতোমধ্যে তাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। জামাইয়ের পোস্টিং ঢাকায়। এদিকে প্রোভস্টকন্যার ভার্সিটির পড়া শেষ হয়নি। সিদ্ধান্ত হল, বাচ্চাকে নানা-নানীর কাছে রেখে স্বামী-স্ত্রী দু'জন ঢাকায় থাকবে। সে সূত্রে আমাদের মহল্লায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে উঠল দু'জনে। স্ত্রী ভার্সিটির পড়া শেষ করার জন্য ভর্তি হল UDA (ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ)–এ। কর্মদিবসে নাস্তা সেরে প্রথমে স্বামী বেরিয়ে যায় তার অফিস মতিঝিলের উদ্দেশ্যে। আর স্ত্রীর ভার্সিটি যেহেতু ধানমণ্ডিতে তাই সে ধীরে-সুস্থে প্রস্তুতি নিয়ে পরে বের হয় বলেই স্বামীর ধারণা। আবার দুপুরেই ভার্সিটি ছুটি হয়ে যায় কাজেই সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে স্বামী সবকিছু স্বাভাবিকই দেখতে পায়। ছুটি-ছাটায় দু'জনে রাজশাহী গিয়ে পুত্রকে খানিকটা আদর দিয়ে আসে। এছাড়া ঢাকা থেকে মোবাইলে নিয়মিত খোঁজ-খবরও নেয়। ইদানিং পুত্রধন দু'চারটি কথা বলা শিখেছে, তার সাথেও মা-বাবার 'হাই হ্যালো' হয়। হঠাৎ একদিন কী এক কারণে স্বামী তার অফিস থেকে স্ত্রীকে ফোন করে। কিন্তু স্ত্রীর মোবাইল বন্ধ। বারবার চেষ্টা করেও সংযোগ পায় না। মোবাইল ব্যবহারকারীর বিপদের আশঙ্কায় তার মন অস্থির হয়ে ওঠে। অবশেষে ফোন করে রাজশাহীতে শ্বশুর-শাশুড়িকে এবং কলাবাগানের বাসিন্দা স্ত্রীর বড় বোনকেও। সবাই মিলে চেষ্টা করেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হল না। শেষে মা-বাবার নির্দেশে বড় বোন কলাবাগান থেকে ছুটে আসে ছোট বোনের বাসায়। বাসার দরজা ভেতর থেকে আটকানো। বোন কলিংবেল চাপল কয়েক বার, কোনও সাড়া-শব্দ নেই। বেশ কিছুক্ষণ বেল চাপাচাপির পর দরজা খুলে অপরিচিত এক যুবক মাথা নিচু করে বের হয়ে গেল বড় বোনের সামনে দিয়ে। তারপর বড় বোন বাসায় প্রবেশ করল এবং ছোট বোন ও তার বিছানা-পত্র সন্দেহজনক এলোমেলো দেখতে পেল। ঘটনাদৃষ্টে বাকরুদ্ধ বড় বোন কিছুক্ষণ পর নিজ বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেল। আর মা-বাবাকে ঘটনার সারাংশ ফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দিল। বোনজামাইকে শুধু এতটুকু জানাল যে, তার স্ত্রী বাসায়ই আছে, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। স্বামী এ সংবাদে শান্ত হয়ে গেল। অফিস শেষে সন্ধ্যায় স্বামী বাসায় ফিরে দেখে স্ত্রী ফ্যাকাশে চেহারায় হতবিহ্বল হয়ে বসে আছে। কারণ জানতে চাওয়ামাত্রই স্ত্রী কান্না-জড়িত কণ্ঠে আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক বক্তব্য দেয়া শুরু করল। বলল, ও মাত্র আজকেই আমাদের বাসায় এসেছে; আপু অযথাই আমাকে এ রকম সন্দেহ করল কেন? এ জাতীয় বক্তব্য শোনে স্বামী একটু নড়েচড়ে উঠল। কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আরে! ও সব কিছু না, তুমি এতো মন খারাপ করো না তো, সব ঠিক হয়ে যাবে। এভাবে খানিক সান্ত্বনা দিয়ে স্বামী ফ্ল্যাট থেকে বের হল এবং বিল্ডিংয়ের অতিথিদের এন্ট্রিখাতা চেক করে দেখল, তার ফ্ল্যাটে প্রায় প্রতিদিনই একজন পুরুষ অতিথির আগমনের স্বাক্ষর রয়েছে। ঘটনার ইতিবৃত্ত তার আর বুঝতে বাকী নেই। তবে স্ত্রীর সঙ্গে কোন রকম রাগ-ঝাল না দেখিয়ে তাকে আস্থায় আনার কৌশল অবলম্বন করল। সে নিজেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সাজিয়ে রাখল শোয়ার আগ পর্যন্ত। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় গিয়ে স্ত্রীকে বলল, দেখো, মানুষমাত্রই ভুল করতে পারে। তাছাড়া আমি যথেষ্ট উদার ছেলে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বলে কি এই বয়সে আমাদের বন্ধু-বান্ধব থাকবে না! তোমার বন্ধু সে আমারও তো বন্ধু! আচ্ছা ওর নামটা যেন কী? তোমার ক্লাসমেট বোধহয়? এটুকু বলতেই স্ত্রী গড়গড় করে গোটা ইতিহাস বলা শুরু করে দিল। জানা গেল, ইউডাতে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর থেকেই ছেলেটির সঙ্গে তার পরিচয়। অতঃপর প্রেম এবং তারপর থেকে সে তার অলিখিত স্বামী। এখন লিখিত বেচারার সঙ্গে হয় রাতযাপন আর অলিখিতের সঙ্গে হয় দিনযাপন এবং একই ঘরে। স্ত্রীর মুখে নিজের নির্লজ্জতার এমন বিবরণ শোনেও স্বামী নিয়ন্ত্রণ হারায়নি।

(২৮ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

গ্রন্থ পরিচিতি

সহীহ হাদীসের আলোকে নামায শেখার নির্ভরযোগ্য কিতাব

নবীজীর নামায

- আবুল ফযল মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া -

লেখক ও কিতাব পরিচিতি

মূল কিতাবটি উর্দূ ভাষায় রচিত। নাম *নামাযে পয়াম্বর*। লেখক মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানরত ড. শাইখ মুহাম্মদ ইলিয়াস ফয়সাল। কিতাবটি উলামা-তুলাবাসহ সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত। কিতাবটির অসাধারণ বিন্যাস এবং সূচনা ও সমাপ্তির ক্ষেত্রে অনুসৃত বরকতময় পদ্ধতি এর মূল কারণ। লেখক বলেন, এ কিতাবের তথ্য সংগ্রহের কাজ মদীনা মুনাওয়ারায় সম্পন্ন হয়েছে। গ্রন্থনা ও বিন্যাসের সূচনা বাইতুল্লাহর ছায়ায় মাকামে ইবরাহীমের নিকটে হয়েছে। প্রথম দিকের কিছু অংশ এবং শেষের আলোচনাগুলো মসজিদে নববীতে রিয়াযুল জান্নাহয় বসে লেখা হয়েছে। আর এর সমাপ্তি হয়েছে বাইতুল্লাহর শীতল ছায়ায় বসে।

লেখার উদ্দেশ্য

গ্রন্থকার মূল গ্রন্থের ভূমিকায় রচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেন, 'আজকাল এমন এক দলের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে যাদের ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনার মূল কথা হচ্ছে, নামায সংক্রান্ত বিশেষ কিছু মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে এমন উত্তপ্ত আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো যে আলোচনায় শরীয়ত নির্দেশিত নিয়ম-নীতির কোনই তোয়াক্কা করা হবে না। অন্যদিকে তাদের কাছে রয়েছে সুন্নাহর এক অভিনব মাপকাঠি। তা এই যে, যে কাজ তারা করে থাকেন তা হল সুন্নাহ আর অধিকাংশ মুসলিম যে কাজ করেন তা সুন্নাহ বিরোধী।'

তাদের প্রচার-প্রচারণার সারকথা এই দাঁড়ায় যে, হাদীস শরীফের সঙ্গে কেবল তাদেরই সম্পর্ক রয়েছে। আর অন্যসব মুসলিম হাদীস মোতাবেক আমল করা থেকে বঞ্চিত। এইসব বিভ্রান্তিকর প্রচার-প্রচারণা নিরসনের লক্ষ্যেই এ পুস্তকের রচনা।

অনুবাদ ও সম্পাদনা

পুস্তকটির অনুবাদ করেছেন গবেষণা-মূলক উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়ার উস্তাদ ও *মাসিক আলকাউসারের* সহসম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া আব্দুল্লাহ। সম্পাদনার কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়ার সম্মানিত আমীনুত তা'লীম ও *মাসিক আলকাউসারের* তত্ত্বাবধায়ক হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক দা.বা.।

উপস্থাপনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী

কিতাবটি সহীহ হাদীসে উল্লেখিত মাসনূন নামাযের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, হাদীস বিশারদগণের উদ্ধৃতি, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় সমৃদ্ধ একটি প্রামাণিক উপস্থাপনা। এতে সহজভাবে ইলমী উপস্থাপনা অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক মাসআলার সাথে দলীল উল্লেখ রয়েছে। কিতাবটি সংকলন করতে গিয়ে তাফসীর, হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ের প্রায় একশত কিতাবের সাহায্য নেয়া হয়েছে। তবে ইখতিলাফী মাসাইলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং দলীল-প্রমাণের তুলনামূলক আলোচনা পাদটীকায় সংযোজিত হয়েছে। আর মূল আলোচনা সহজ সাবলীল রাখার উদ্দেশ্যে অনুবাদে এ বিশ্লেষণমূলক আলোচনাগুলো পরিশিষ্ট আকারে কিতাবের শেষে নেয়া হয়েছে। হাদীসের কিতাবের উদ্ধৃতির জন্য খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে প্রয়োজনের সময় যে কোন সংস্করণ থেকে হাদীসটি বের করে নেয়া পাঠকের জন্য সহজ হয়। আর অনূদিত সংস্করণে খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরও সংযোজিত হয়েছে।

পাঠকের উপকারার্থে তৃতীয় সংস্করণে কিতাবের শেষে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি প্রবন্ধ সংযুক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে সম্মানিত সম্পাদক হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক দা.বা.-এর তাহকীকপূর্ণ মূল্যবান চারটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধগুলো হচ্ছে, (১) মহিলাদের নামায-পদ্ধতি (নারী-পুরুষের নামাযের পার্থক্য)। (২) সহীহ হাদীসের আলোকে তারাবীহ'র রাকাত সংখ্যা। (৩) সহীহ হাদীসের আলোকে ঈদের নামায। (৪) হাদীস ও সুন্নাহয় কাবলাল জুমু'আ। পঞ্চম প্রবন্ধটি হল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উমরী কাযা। এটি অনুবাদকের রচনা।

কিতাবে উল্লেখিত হাদীস সম্পর্কে কিছু কথা

গ্রন্থকার বলেন, এ কিতাবে কুরআন মাজীদের মোট **৩১**টি আয়াত এবং **৩১০**টি হাদীস ও আছার উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্য থেকে **১৪৭**টি হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম কিংবা এ দু'টোর কোন একটিতে রয়েছে। ৮৮টি হাদীস ছয় কিতাবের অপর চারটি– সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনে মাজাহ থেকে নেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৫টি হাদীস অন্যান্য গ্রহণযোগ্য হাদীস গ্রন্থ যথা: মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সুনানে বাইহাকী ও তুহাবী শরীফ ইত্যাদি থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ অর্ধেকের কিছু কম হাদীস সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য হাদীসের বেলায়ও তা সহীহ হওয়ার প্রতি যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বরং অধিকাংশ হাদীসের সঙ্গেই মুহাদ্দিসীনে কেরামের স্বীকৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।

আর পরিশিষ্টে সংযুক্ত পাঁচটি প্রবন্ধের হাদীসসমূহের বেলায়ও একই কথা যে, তারা সহীহ ও আমলযোগ্য হাদীস উল্লেখ করার ব্যাপারে সচেষ্ট থেকেছেন।

উলামায়ে কেরামের হৃদয়গ্রাহী অভিমত

এ কিতাবের ব্যাপারে অনেক বরেণ্য উলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীনে ইযাম বিভিন্ন ভাষায় তাদের হৃদয় নিংড়ানো অভিব্যক্তি পেশ করেছেন।

(৪৩ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিশেষ প্রতিবেদন

একটি শাহাদাত কয়েকটি শিক্ষা

এই মাত্র সাহরী শেষ হল। তখনও আযান পড়েনি। ইতিকাফের সঙ্গীদের সঙ্গে হালকা আলোচনা করছিলাম। জরুরী সামান-পত্র রাখার বাক্সটি খুলে কী মনে করে মোবাইল হাতে নিয়েছি। স্ক্রীনের আলো জ্বলতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। ১৯টি মিসডকল!! বিস্তারিত জানতে 'ওকে' বাটন চাপতেই বুকটা আরেক দফা কেঁপে উঠল। রাত এগারোটা থেকে তিনটার মধ্যে কাছের দূরের এমন কতগুলো মানুষ আমার খোঁজ করেছে, যারা সাধারণ কোন কারণে এ সময় খোঁজার কথা নয়। ইন্নালিল্লাহ পড়তে পড়তে ফোন করলাম কাছের বন্ধু মাওলানা জালীস মাহমূদকে। প্রথম বার রিং বাজতেই রিসিভ হল। বলল, শুনেছেন, 'আমাদের আবূ সাঈদ ভাই আছে না... হ্যাঁ, হ্যাঁ, মুফতী সাহেব হুযূরের সাহেবজাদা... আজ রাতে পাকিস্তানে শাহাদাত বরণ করেছেন।' মনে হল, ভুল শুনেছি কিংবা ও ভুল করে ভাই আবূ সাঈদের নাম বলছে। সঠিক সংবাদটি জানার জন্য বললাম, কী সব যা তা বকছো, আবার বলো। আমাকে অবাক করে সে আগের কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করল, সেই সঙ্গে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। কল্পনায় ভেসে উঠল— জন্মভূমি থেকে হাজার মাইল দূরে পাকিস্তানের কোন এক মসজিদের বারান্দায় নামাযের পর কয়েকজন তরুণ পাশাপাশি উপবিষ্ট। হঠাৎ কোত্থেকে উদিত হল দুই জিঘাংসু-হন্তারক এবং চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে ব্রাশ ফায়ার করল আল্লাহর ঘর-মসজিদ অভিমুখে। মুহূর্তেই বারান্দার তরুণেরা যমীনে লুটিয়ে পড়ল যেখানে কিছুক্ষণ আগেই তারা রেখে এসেছে সিজদার দাগ। তিন শহীদের তাজা খুনে লালে লাল হয়ে উঠল আল্লাহর ঘর। আর তরুণেরা সবুজ পাখির বেশে উড়ে গেল জান্নাতের ঠিকানায়। এদেরই একজন আমাদের হামসবক, প্রিয় ভাই মাওলানা আবূ সাঈদ রহ.। গত ২৭ রমাযান (দিবাগত রাতে) বাদ ইশা তিনি পাকিস্তানের করাচীতে শাহাদাত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। (আল্লাহ তা'আলা তার ও তার সঙ্গীদের শাহাদাতকে কবুল করুন এবং পরিবার-পরিজনকে উত্তম বিনিময় দান করুন।)

বস্তুত 'শাহাদাত' জগতের দুর্লভ সৌভাগ্য-সমূহের একটি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে এ নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন। কল্যাণযুগে 'শাহাদাত', 'শহীদ' ও 'শহীদপরিবার'কে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। বর্তমানে সবকিছুকেই উল্টো করে দেখার নিয়ম, তাই 'শহীদ' ও 'শাহাদাত'কে এখন ভিন্নচোখে দেখা হয়। কিছুকাল আগেও এমনটি ছিল না। সেদিন পর্যন্তও মুসলমানদের হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না, শহীদের মর্যাদা ও শহীদপরিবারের সম্মান জাগরুক ছিল। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. এর কথা শুনেছি, শহীদপরিবারের গৌরব অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি তার এক পৌত্রকে রুশ কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে আফগান রণাঙ্গনে পাঠিয়েছিলেন এবং তার সে তামান্না পুরাও হয়েছিল। আজও নূরিয়া মাদরাসার মাকবারায় হাফেজ্জীপৌত্র শহীদ রহমতুল্লাহর কবর ভোরের শবনমে সিক্ত হয়। যিন্দাদিল মানুষ সেখানে অনুভব করেন শাহাদাতের খোশবু। অব্যাহত প্রোপাগাণ্ডা আর হাদীসে বর্ণিত 'ওয়াহান' অর্থাৎ মৃত্যুভয় ও দুনিয়ার আসক্তি আমাদের দিল থেকে শাহাদাতের তামান্না নিঃশেষ করে দিয়েছে। মুসলমান এখন শহীদী মৃত্যু থেকেও পালাতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দীনী চেতনার এ চরম দৈন্যের যুগেও তার কিছু বান্দাকে আমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন, যাদেরকে দেখে আমরা দীনের সঠিক চেতনা ও সত্যিকার অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার শাইখুল হাদীস, মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. আমাদের তেমনই এক চেতনার মিনার।

আমাদের এ লেখা একজন পিতা ও একজন আলেমে দীনের কলিজার টুকরো পুত্রের শাহাদাতের সংবাদ গ্রহণ ও পরবর্তী আচরণ-উচ্চারণ প্রসঙ্গে লিখিত। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় এতে আমাদের জন্য শিক্ষার অনেক উপকরণ রয়েছে।

শাহাদাতের ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পরিচিত মহলে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদ পান শহীদের পিতা মুফতী সাহেব হুযূর দামাত বারাকাতুহুমও। বাদ ফজর থেকে হুযূরের বাসায় সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে উলামা, তালাবা ও শুভানুধ্যায়ী জনসাধারণের আগমন হতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় তারা হুযূরের আচরণ ও উচ্চারণে ধৈর্য ও স্থৈর্যের বিপরীত কিছু লক্ষ্য করেননি। যারা হুযূরকে জানেন তারা এতে বিস্মিত হননি। কেননা এটা তার স্বভাবজাত একটি গুণ; ইতোপূর্বে বহু বিপদাপদে তা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু যারা তাকে ততোটা জানেন না, তারা বিস্মিত হয়েছেন যে, এ কেমন পিতা! পুত্রবিয়োগেও যিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছেন; না হা-হুতাশ করছেন, আর না আছে কাতরতা! অনেকে ফোন করে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেছেন— হুযূর! একটা দুঃসংবাদ শোনলাম...। হুযূর তাদেরকে বলেছেন, 'দুঃসংবাদ বলছেন কেন? আপনারা আমাকে সুসংবাদ দিন যে, আপনি তো মা-শা-আল্লাহ শহীদের পিতা!' সমবেদনা জ্ঞাপনকারী এক আল্লাহর বান্দা বলছিলেন, হুযূর! শহীদ তো হয়েছে মা-শা-আল্লাহ, কিন্তু এভাবে হওয়া কাম্য ছিল না। হুযূর তাকে বললেন, শাহাদাত নসীব হয়েছে এটাই আমার কাছে বড় বিষয়; কিভাবে হল সেটা ভেবে কী লাভ? বস্তুত শাহাদাতের ফায়দা ও শহীদের মর্যাদা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তিই এমন মন্তব্য করতে পারেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, পুত্রের বিয়োগ-ব্যথায় তার অন্তর কেঁদে ওঠেনি। না, তিনি কেঁদেছেন এবং তার চোখ অশ্রু ঝরিয়েছে। তবে সেই অশ্রুপাত ও নীরব রোদন ছিল নবীজীর সুন্নাত ও নায়েবে নবীর যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করে। এ ব্যাপারে তিনি 'মন তো সামলে নিয়েছে,

চোখকে তো মানানো যাচ্ছে না।' বলে মন্তব্য করেছেন। সাধারণত নিকটাত্মীয়ের ইন্তেকালে মানুষ মুষড়ে পড়ে। পুত্র হলে তো কথাই নেই– সকল কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও হুযূরের আচরণ ছিল শিক্ষণীয়। জামি'আ রাহমানিয়ার দারুল ইফতার যে সকল দায়িত্বশীল হুযূরের দীনী সফরসমূহের খোঁজ-খবর রাখেন তারা বলেছেন, উক্ত ঘটনার পর হুযূরের পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রামগুলো আগ-পিছ করা হবে কি না এ ব্যাপারে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। বিষয়টি হুযূরকে জানানো হলে তিনি বললেন, 'আবেগ নয়, দীনী তাকাযাকে সব সময় অগ্রগণ্য রাখতে হয়। কাজেই পূর্ব নির্ধারিত সব প্রোগ্রামই বহাল থাকবে ইনশাআল্লাহ।' হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী একান্ত অপারগতা ব্যতীত মৃত ব্যক্তিকে যথাদ্রুত নিকটস্থ কবরস্থানে দাফন করা তার অধিকার। হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. ইচ্ছে করলে পুত্রের লাশ দেশে আনতে পারতেন। কিন্তু দেশে আনা তো পরের কথা, হুযূরের নির্দেশ ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আইনী জটিলতা শেষ করে নিকটস্থ কবরস্থানে দাফন করে দেয়া হোক। সে মতে ২৮ রমাযান বাদ যোহর পাকিস্তানেই গুলিস্তানে জাওহারের একটি কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। নেক কাজ যত বড়ই হোক না কেন, কবুল হওয়াই হল আসল কথা। ভাই আবূ সাঈদের শাহাদাতের সৌজন্যে এ সবকটি আমরা তাজা করার সুযোগ পেয়েছি। তার শাহাদাতের পর হুযুর যেখানেই গিয়েছেন এবং যখনই তার সামনে এ প্রসঙ্গ উঠেছে তিনি বলেছেন, আপনারা দু'আ করবেন, আল্লাহ তা'আলা যেন মেহেরবানী করে আবূ সাঈদের শাহাদাত কবুল করে নেন। একথা বলার সময় হুযুরের মুখমণ্ডলে কেমন এক অদ্ভূত আকুতি ছড়িয়ে পড়তো। হ্যাঁ, কলিজার টুকরো তরুণ পুত্র শহীদ হয়েছে, শহীদের অনাগত সন্তানটি মাতৃগর্ভেই পিতাকে হারিয়েছে এ নিয়ে কোন আফসোস নেই– আবদার শুধু দয়াময় আল্লাহ যেন পুত্রের শাহাদাতকে কবুল করে নেন! আসুন, আমরাও বলি, হে আরশের অধিপতি সমুচ্চ মর্যাদার মালিক! আপনার সম্মান ও মর্যাদার খাযানায় কোন কমতি নেই, আপনি মেহেরবানী করে মাওলানা আবূ সাঈদ রহ. এর শাহাদাতকে কবুল করুন এবং তার অনাগত সন্তানটিকে দাদাজীর যোগ্য উত্তরসুরী করুন।

একটি সুস্বপ্ন : আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ব্যতীত সাধারণ মুমিনের স্বপ্ন শরীয়তের দলীল নয়। তবে এর দ্বারা সান্ত্বনা ও সুধারণা লাভ করা যায়। মাওলানা আবূ সাঈদ রহ. এর শাহাদাতের পর তার আম্মাজানের তামান্না ছিল, আল্লাহ তা'আলা যদি কোনওভাবে আমাদেরকে তার শাহাদাতের কবুলিয়তের দিকে ইঙ্গিত দিতেন তাহলে দিল পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয়ে যেতো। শহীদজননীর সে তামান্না আল্লাহ তা'আলা পুরা করেছেন। শাহাদাতের কয়েকদিন পর শহীদ আবূ সাঈদ রহ. এর সহপাঠী, ঝিনাইদহ নিবাসী মাওলানা ইনআমুল হাসান স্বপ্নে দেখেন, এক উঁচু জায়গায় আসমান থেকে নেমে এসেছে একটি আলোর ধারা। চোখ ধাঁধানো সে আলো অনুসরণ করে তিনি সেই স্থানে আরোহণ করেন। হঠাৎ দেখেন সেখানে মাওলানা আবূ সাঈদ শায়িত, আর আলোর ধারাটি মাওলানার পা দু'টোকে অপার্থিব উজ্জ্বল করে তুলেছে। তারপর আলোকটি পা থেকে উপরের দিকে উঠতে থাকে এবং চেহারার ওপর গিয়ে স্থির হয়। ধীরে ধীরে মাওলানার চেহারাটি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে এবং সেখানে ভেসে ওঠে কুরআনুল আযীমের আয়াত-সদৃশ কিছু আরবী বাক্য। হযরত মুফতী সাহেব হুযুরকে এ সম্পর্কে অবগত করা হলে তিনি বলেন, এটা তার শাহাদাত কবুল হওয়ার আলামত হতে পারে। আর আরবী বাক্যগুলো সম্ভবত কুরআনুল কারীমের শাহাদাত সম্পর্কিত আয়াত– যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা (তাদের জীবিত থাকার বিষয়টা) উপলব্ধি করতে পারো না।' আল্লাহ তা'আলা এ স্বপ্নকে সত্য করে দিন এবং আমাদেরকে ভাই আবূ সাঈদ রহ. এর শাহাদাতের বরকত নসীব করুন। আমীন।

লেখক, মাওলানা আবূ সাইম
মুদাররিস, জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া, হাজারীবাগ, ঢাকা।
ইমাম ও খতীব, বছিলা বড় মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

(জরুরী শর্তাবলী; ৪৬ নং পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেমন, বেহুদা গল্প-গুজব করা, ঘোরা-ফেরা করা ইত্যাদি। বর্তমানে তালিবে ইলমের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও সময় নষ্টকারী হল মোবাইল ফোন। তলবে ইলমের জন্য এটা প্রাণঘাতী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তালিবে ইলম ইলমও চর্চা করবে আবার মোবাইলও চর্চা করবে এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়! কারণ তার নাম তো 'তালিবে ইলম'; 'তালিবে রং-তামাশা' নয়। সে তো অঙ্গীকার করেই মাদরাসায় ভর্তি হয়েছে যে, মোবাইল ফোন রাখবে না, মোবাইলের মালিক হবে না। কিন্তু জানা যায় বাড়িতে তার মালিকানাধীন মোবাইল আছে। ছুটিতে বাড়ি গিয়ে মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকে। এমনকি মসজিদে গিয়ে নামায পড়ারও তাওফীক হয় না। এর চেয়েও জঘন্য ব্যাপার হল, মাদরাসার পাশে কোন দোকানদারের কাছে মোবাইল রেখে দেয় এবং সুযোগ মতো ব্যবহার করে। অথচ তার ওয়াদা ছিল, সে মোবাইল রাখবে না। তো এই মুনাফেকী স্বভাবের সঙ্গে কীভাবে ইলম আসবে!

কাজেই উচিৎ হবে, তালিবে ইলমের কল্যাণের জন্য তার আসাতিযায়ে কেরাম যে যে নির্দেশ দিবেন, যা যা বর্জন করতে বলবেন, সবকিছু সানন্দে মেনে নেয়া এবং সে অনুযায়ী আমল করা। তাহলেই সে সহীহ ইলম অর্থাৎ ইলমে ইলাহী অর্জন করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা সকল তালিবে ইলমকে এসব শর্তাবলী মেনে সত্যিকার ওয়ারিসে আম্বিয়া হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক: মুহাদ্দিস ও শিক্ষাসচিব, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

মুহাররম ও আশুরা : করণীয় বর্জনীয়

মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল-মাসউদ

মুহাররমুল হারাম। হিজরী সনের প্রথম মাস। আরবী ভাষায় শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিষিদ্ধ, সম্মানিত। প্রাক-ইসলামী যুগে এ মাসে সর্বপ্রকার যুদ্ধ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল। আরবরা এ মাসে যাবতীয় কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখতো। ইসলামের প্রথম দিকে মুসলমানগণও তা মেনে চলতো। কিন্তু পরবর্তীতে মুশরিকদের পক্ষ থেকে এটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করায় ইসলামী শরীয়ত হুকুমটি রহিত করে দেয়। ফলে জিহাদ ও বিভিন্ন অভিযান এ মাসে আর নিষিদ্ধ থাকেনি। আর দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে এ মাসের সম্মান ও আদব প্রদর্শন এবং এ মাসে ইবাদত-বন্দেগীতে সবিশেষ যত্নবান হওয়ার বিধান এখনও বহাল আছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার নিকট মাসের সংখ্যা বারটি, যা আল্লাহর কিতাব (লাওহে মাহফুয) অনুযায়ী সেই দিন থেকে চালু আছে, যে দিন আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এর মধ্যে চারটি মাস (মুহাররম, শাবান, যিলক্বদ ও যিলহজ্জ) মর্যাদাপূর্ণ। এটাই দীন (-এর) সহজ-সরল (দাবী)। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহের ব্যাপারে নিজেদের প্রতি জুলুম করো না। (সূরা তাওবা: ৩৬) প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম আবু বকর জাস্সাস রহ. বলেন, এ চার মাসের বৈশিষ্ট্য হল, যারা এ মাসসমূহে ইবাদতের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাকি আট মাসও ইবাদত করার বিশেষ হিম্মত ও শক্তি দান করবেন। অনুরূপ যে ব্যক্তি চেষ্টা করে কোনও রকমে এ চার মাসে নিজেকে পাপাচার থেকে বাঁচিয়ে রাখবে তার জন্য বাকি আট মাসও সকল প্রকার পাপ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে।

গুরুত্ব ও ফযীলত

মুহাররম মাসে বিশেষত এর ১০ তারিখে বড় বড় বহু ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং কুদরতী কাজ সংঘটিত হয়েছে। এগুলো নিঃসন্দেহে এ মাসের গুরুত্ব ও ফযীলতের স্বাক্ষর বহন করে। উদাহরণত হযরত আদম আ. এর তাওবা কবুল হয়। হযরত নূহ আ. এর কিশতি জুদি পাহাড়ে এসে স্থির হয়। হযরত ইবরাহীম আ. এর জন্ম ও হযরত সুলাইমান আ. এর বাদশাহী এ মাসের এ দিনে প্রদান করা হয়। হযরত ইউসুফ আ. কে কূপ থেকে উদ্ধার করা হয়। হযরত আইয়ূব আ. কঠিন ও জটিল রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন। হযরত মূসা আ. ও বনী ইসরাঈল ফেরআউনের জুলুম-অত্যাচার থেকে চিরমুক্তি লাভ করেন। হযরত ইউনুস আ. মাছের পেট থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং তার কওমের তাওবা কবুল হয়। হযরত ঈসা আ. আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতে পিতার ঔরস ব্যতীত মাতৃগর্ভ হতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং এ মাসের এ দিনেই তাকে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। হযরত ইদরীস আ.কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। সর্বশেষ নবীদৌহিত্র হযরত হুসাইন আ. কারবালা প্রান্তরে মর্মান্তিকভাবে সপরিবারে শাহাদাত বরণ করেন।

করণীয়

(এক) নতুনবর্ষের শুরুতে পুরনো বছরের ঈমান-আমল বিষয়ক ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা মুহাররমের অন্যতম দাবী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

অর্থ : আর তিনিই সেই সত্তা যিনি রাত ও দিনকে পরস্পর অনুগামী করে সৃষ্টি করেছেন সেই ব্যক্তির জন্য যে উপদেশ গ্রহণের ইচ্ছা রাখে কিংবা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়।

(দুই) বেশি বেশি নফল রোযা রাখা। হাদীস শরীফে এসেছে,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ

অর্থ : রমাযানের পর সর্বোত্তম রোযা হল, আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা। (মুসলিম শরীফ) অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল,

أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم

অর্থ : রমাযানের পর আপনি আমাকে আর কোন মাসের রোযা রাখতে বলেন? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, রমাযানের পর রোযা রাখার ইচ্ছে করলে তুমি তা মুহাররম মাসে রাখবে।

(তিন) অধিক পরিমাণে তাওবা করা। উপর্যুক্ত হাদীসের শেষাংশে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীকে এ-ও বলেছিলেন,

فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين

অর্থ : তুমি মুহাররমের রোযা রাখবে, কারণ এটা আল্লাহ তা'আলার (বিশেষ) মাস। এ মাসে একটি দিন আছে যে দিন আল্লাহ তা'আলা এক জাতির তাওবা কবুল করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অন্যান্য জাতির তাওবা কবুল করবেন।

১০ই মুহাররম অর্থাৎ আশুরার ফযীলত ও করণীয়

(১) রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৭৯৪)

(২) আশুরার একদিনের রোযার উসিলায় অতীতের এক বৎসরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে বলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশা ব্যক্ত করেছেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৮০৪)

(৩) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও আশুরার রোযা ছাড়তেন না। (সুনানে নাসায়ী; হা.নং ২২৩৬) **(৩২ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)**

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

আকাইদ

সিদ্দিকুর রহমান
ভাদ্রা নগর, টাঙ্গাইল।

৩৯ প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছে,
ক. আমি আল্লাহকে দেখেছি, তাকে গোসল করিয়েছি এবং খাইয়েছি।
খ. নামায ইসলামের ১৬ নম্বরে।
গ. আল্লাহ যে নবীও সে।
ঘ. সে আল্লাহ না বলে, 'হরিবল হরিবল' বলে।
এখন জানার বিষয় হল, এসব কথা বলার দ্বারা তার ঈমানের কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না বা তার ঈমান আছে কি না? আর সে যদি রমাযান মাসে দাওয়াত করে ইফতারী খাওয়াতে চায়, তাহলে মুসলমানদের জন্য তাতে শরীক হওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ক. পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, ইহজগতে চর্মচোখে আল্লাহ তা'আলাকে কেউ দেখতে পারবে না এবং তাঁকে দেখা সম্ভবও নয়। ইরশাদ হচ্ছে,

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

অর্থ : দৃষ্টিসমূহ আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পারে না, কিন্তু মাখলূকের দৃষ্টিসমূহ তিনি দেখতে পান। তাঁর সত্তা অতি সূক্ষ্ম এবং তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত। (সূরা আনআম- ১৩০)

অতএব, কেউ যদি পৃথিবীতে থাকাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে দেখার দাবী করে তাহলে সে এই আয়াতকে অস্বীকার করায় পথভ্রষ্ট, যিন্দীক ও বে-ঈমান সাব্যস্ত হবে। আর গোসল করানো ও খাওয়ানো অবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে স্বপ্নে দেখা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা মাখলূক কর্তৃক গোসল করানো ও খাওয়ানোর মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'তিনি এমন যে, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।' (সূরা ইখলাস- ২)

সুতরাং প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি যদি এমন কিছু স্বপ্নে দেখে থাকে, তাহলে সে শয়তানকে দেখেছে বা তার হরিবলকেই স্বপ্নে দেখেছে।

মোটকথা, প্রশ্নের বক্তব্য বাস্তব হলে উক্ত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপকারী হবে। আর এ জাতীয় লোককে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে সবচেয়ে বড় জালিম ঘোষণা করেছেন। (সূরা হুদ- ১৮)

খ. 'নামায ইসলামের ১৬ নম্বরে ' এ কথা বলার দ্বারা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্য থেকে দ্বিতীয় স্তম্ভ নামাযকে তুচ্ছজ্ঞান করা হয়েছে। যা কুরআন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। এটাও একটা কুফুরী আকীদা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি ১. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। ২. নামায কায়েম করা ইত্যাদি। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৮)

গ. 'আল্লাহ যে নবীও সে' এটাও শিরকী আকীদা। এমন আকীদায় বিশ্বাসী লোক কখনোই মুসলমান হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা সূরা বনী ইসরাঈলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ বান্দা বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর এটাতো স্পষ্ট বিষয় যে, মনীব আর বান্দা এক হতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে,

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

'পবিত্র সেই সত্তা যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান, যার চার পাশকে আমি বরকতময় করেছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু জানেন।' (সূরা বনী ইসরাঈল- ১)

ঘ. আল্লাহ না বলে হরিবল বললেও ঈমান থাকবে না। কারণ এটা হিন্দুরা নিজেদের দেবতাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহকে আল্লাহ না বলে হরিবল বলবে সে হিন্দু তথা কাফের হয়ে যাবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে ধর্মীয় বিষয়ে সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে সে তাদের অর্ন্তভুক্ত বলে গণ্য হবে।' (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৪০৩১)

সারকথা, প্রশ্নোক্ত অভিযোগগুলো বাস্তব হয়ে থাকলে, প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি বে-ঈমান হয়ে গেছে। তার স্ত্রী মুসলমান হয়ে থাকলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে। এখন তার করণীয় হল, তাওবার মাধ্যমে নতুনভাবে ঈমান গ্রহণ করা। এবং সমস্ত ফাসিদ আকীদা পরিহার করা। আর বিবাহ দোহরিয়ে নেয়া। সে যদি তাওবা করে পুনরায় ঈমান গ্রহণ না করে, তাহলে সমাজের মুসলামানদের করণীয় হল, তাকে সামাজিকভাবে সবদিক দিয়ে বয়কট করে রাখা। তার সাথে কোনো ধরণের সম্পর্ক না রাখা এবং কোনো লেনদেন না করা। সে নিজেকে শোধরানোর পূর্বে কোনো দাওয়াত খাওয়াতে চাইলে তাতে শরীক না হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। (সূরা আনআম- ৭০, সূরা নিসা- ১৪, সূরা আ'রাফ- ১৫৮, সূরা বাকারা- ২, সূরা বানী ইসরাঈল- ১১০, সূরা হুজুরাত- ১৫, সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৪৭২৯, শরহু ফিকহিল আকবার; পৃষ্ঠা ১২৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫/২৭০)

ইবাদত

ডা. মোহাম্মাদ আবুল বাশার
প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব বিদ্যালয়, খুলনা।

৪০ প্রশ্ন : ক. আরাফার ময়দানে উকূফের সময় কি কি আমল করা উত্তম? অনেকে বলে, উকূফের সময় দু'আ, তাসবীহ, ইস্তিগফারের সাথে সাথে নফল নামায এবং কুরআন তিলাওয়াত করাও উত্তম। মূল বিষয়টা জানতে চাই।
খ. হজ্জের সময় মক্কার বাসায় অধিকাংশ সামানা রেখে কিছু সামানা নিয়ে মিনা, মুযদালিফা ও আরাফায় গেলে মক্কাসহ উক্ত স্থানগুলো মিলে কমপক্ষে পনের দিন থাকা পড়লে মুকীম হবে কিনা?

উত্তর : আরাফায় উকূফের সময় যেসব আমল করা উত্তম তা নিম্নরূপ-
বেশি বেশি দু'আ করা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম দু'আ হচ্ছে আরাফার দিনের দু'আ।
তাকবীর বলা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া। নিজের জন্য এবং সমস্ত মুমিনের জন্য ইস্তিগফার করা। কুরআন তিলাওয়াত করা। দুরূদ শরীফ পড়া। বেশি বেশি এই দু'আটি পড়া,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, আরাফায় অবস্থানের সময় এসব আমল করা

উত্তম। আর কেউ যদি তখন নফল নামায পড়তে চায়, তাহলে পড়তে পারে। তখন নফল নামায পড়া নাজায়েয নয়। (মু'আত্তা ইমাম মালেক; হা.নং ২৫৫, মানাসেকে মোল্লা আলী কারী; পৃষ্ঠা ৫৮৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২২৯, আলবাহরুর রায়েক ২/৫৯৫)

খ. বর্তমানে যদি কেউ মক্কা, আরাফা, মিনা, মুযদালিফা মিলিয়ে ১৫ দিন বা তার বেশি থাকে, তাহলে সে মুকীম হয়ে যাবে। (আল বাহরুর রায়েক; ২২২৫, কিতাবুল মাসাইল ৩/২৭৬-৭৮)

মু'আমালাত

সুমাইয়া আখতার
পাঁচ্চর, শিবচর, মাদারীপুর।

৪১ প্রশ্ন : জহুরা নাম্নী জনৈক মহিলার প্রাপ্ত জমি আমাদের নামে রেকর্ড হয়ে যায়। রেকর্ড হওয়ার আগে আমার ফুফা ঐ মহিলার জমি টাকার বিনিময়ে দলীল করে নিয়েছিল। কয়েক বছর আগে আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তি কাগজের ফাঁক-ফোকড়ে আগের রেকর্ড থেকে উক্ত মহিলার কাছ থেকে কিছু জমি দলীল করে নেয়। মহিলার জমি আমাদের নামে থাকায় আমার ফুফাতো ভাইয়েরা এবং পরবর্তীতে দলীলকারী ব্যক্তি আমাদের কাছে তাদের দলীল করা জমি দাবী করে। ফুফাতো ভাইয়েরা আগে থেকেই বলে আসছিল, আমাদের জমি বুঝে পাওয়ার পর তারা জমি পাবে। আর আমাদের জমি বুঝে নেয়ার পর উক্ত মহিলার আর কোনো জমি থাকবে না। কারণ আমাদের বাবা তার প্রাপ্ত পূর্ণ জমিই দলীল করে নিয়েছে। এক পর্যায়ে এলাকার গণ্যমান্য লোকজন এ বিষয়টি নিয়ে সালিস বসে এবং অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর সালিসরা পরবর্তীতে দলীলকারী ব্যক্তিকে কিছু জমি দিয়ে তার সাথে আমাদের সোলাহ করে দেয়। সালিসি সভায় আমার ফুফাতো ভাই-বোনেরা উপস্থিত ছিল এবং তারা এ বিষয়টি সম্পর্কে সম্যকজ্ঞাত ছিল। কিন্তু তখন তারা কিছুই বলেনি বা বলতে পারেনি। পরবর্তীতে আমার ফুফাতো ভাই-বোনেরা তাদের বাবার দলীল করা সেই জমি আমাদের কাছে দাবী করে। তখন আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, আপনারা আপনাদের বাবার দলীল করা সম্পূর্ণ জমি পাবেন না। দ্বিতীয় দলীলকারী ব্যক্তিকে সালিসরা জমি দেয়ার পর যতটুকু জমি থাকবে ততটুকু আপনারা পাবেন। তারা বলে আমাদের বাবা আগে দলীল করেছে। তাই পূর্ণ জমি আমরা পাবো। পরবর্তীতে দলীলকারী কিছুই পাবে না। আমরা বলি, সালিসরা তাকে জমি দেয়ার সময় আপনারাতো কিছুই বলেননি। আমরা একজনের জমি কয় জনকে দিব?

এখন আমার প্রশ্ন হল, আমার ফুফাতো ভাইয়েরা তাদের বাবার সম্পূর্ণ জমি আমাদের কাছে দাবী করতে পারবে কি না? এবং সে জমি আমরা তাদেরকে দিতে বাধ্য কি না? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব ও কবূল দ্বারা চুক্তি পূর্ণ হয়ে যায় (যদি ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার সকল শর্ত পাওয়া যায়)। ক্রেতা বস্তুর মলিক হয়ে যায়, আর বিক্রেতাকে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা ক্রেতার উপর জরুরী হয়ে যায়। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী আপনার ফুফা যেহেতু জহুরা নামক মহিলার কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট জমি পুরোটা ক্রয় করে নিয়েছে এবং সেই মহিলাও তার জমি আপনার ফুফার কাছে বিক্রি করে দলীলও করে দিয়েছে। তাই সেই জমির মালিক আপনার ফুফা হয়ে গেছে। এখন ঐ মহিলা উক্ত জমির মালিক নয়। আর আপনাদের নামে রেকর্ড হওয়া সত্ত্বেও আপনারাও ঐ জমির মালিক নন। ফলে দ্বিতীয় বার যে ক্রয় করেছে তার ক্রয় মোটেও সহীহ হয়নি। দ্বিতীয় ক্রেতা মহিলার কাছ থেকে নিজ প্রদেয় টাকা ফেরত পাবে। সে কারো কাছ থেকে কোনো জমি পাবে না।

সালিসরা যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তা অন্যায় হয়েছে। তাদের উচিত ছিল বিজ্ঞ মুফতীদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সঠিক মাসআলা জেনে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এতদসত্ত্বেও আপনার ফুফাতো ভাইয়েরা সালিসদের সেই অন্যায় সিদ্ধান্ত যদি মেনে নিয়ে থাকে, তাহলে তারা তা মেনে নিতে পারে। এটা তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার। আর যদি তারা মেনে না নেয়, আর আপনাদের কাছে অতিরিক্ত জমি চায়, সে ক্ষেত্রে আপনারা পুনরায় সালিস ডাকুন এবং এই ফাতওয়া অনুযায়ী সালিসদেরকে ফয়সালা করতে বলুন। সালিসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেকর্ডও সংশোধন করে নিবেন। (ফাতহুল কদীর ৫/৪৫৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৩/৩০২, রদ্দুল মুহতার ৪/৫০৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৪/১১৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১৪/৪১৫)

মুজীবুর রহমান জিহাদী
১৫, কলেজ রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

৪২ প্রশ্ন : আমি বিচার প্রশাসন ইনস্টিটিউটে চাকুরী করি। এই অফিসটি সরকারের স্বায়ত্বশাসিত একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী প্রতিষ্ঠান হলেও উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সরকারের রাজস্ব খাত থেকে নিয়মিত বাজেটের মাধ্যমে বেতন-ভাতা পেয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন সুবিধা ছিল না। ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ বিভিন্নভাবে তদবীর করায় সরকার এই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদেরকেও পেনশনসহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ব্যবস্থাটা হল, সরকার রাজস্ব খাত থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য দশ কোটি টাকা বরাদ্ধ দিয়েছে এই শর্তে যে, মূল টাকা কোনো অবস্থাতেই ব্যয় করা যাবে না। এই টাকার লভ্যাংশ দিয়েই পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্ত টাকা সোনালী ব্যাংক লি. এ ডাবল বেনিফিট স্কীম এর আওতায় সাত বছর মেয়াদে এফ.ডি.আর (ফিক্স ডিপোজিট) করে রেখেছে।

আমি উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে পেনশন প্রাপ্ত হয়েছি। এখন প্রশ্ন হল, একজন মুসলমান হিসেবে আমার বা আমার পরিবারের জন্য উক্ত পেনশনের টাকা হালাল হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আপনার প্রতিষ্ঠান আপনাকে যে পেনশন দিচ্ছে সেটা কোনো বৈধ উৎসের আয় থেকে নয়; বরং ব্যাংকের ইন্টারেস্ট বা সুদের টাকা থেকে আপনাকে পেনশন দিচ্ছে। সুতরাং মুসলমান হিসেবে আপনার জন্য বা আপনার পরিবারের জন্য উক্ত টাকা ভোগ করা জায়েয হবে না। এ ক্ষেত্রে আপনার করণীয় হল, উক্ত টাকা উঠিয়ে নিয়ে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া কোনো ভালো কাজে ব্যয় করে দেয়া। (সূরা আলে ইমরান- ১৩০, সূরা বাকারা- ২৭৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৫৮৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪২২, ফাতাওয়া বাইয়েনাত ৪/৭৩)

আবু বকর
মিরপুর, ঢাকা।

৪৩ প্রশ্ন : ক. আমি থ্রিপিছের ব্যবসা করি। কোম্পানীর পক্ষ থেকে প্রতি থ্রিপিছের সাথে ডিজাইন স্বরূপ থ্রিপিছ পরিহিত মেয়েদের ছবি থাকে। যা দেখে থ্রিপিছ প্রস্তুত করা হয়। আর যদি থ্রিপিছ পরিহিত অবস্থায় ডিজাইন পেশ না করা

হয়, তাহলে দেশে বিদেশে কোথাও ক্রেতাগণ থ্রিপিছ গ্রহণ করতে চায় না। এখন আমার জানার বিষয় হল, উক্ত প্রয়োজনে থ্রিপিছের সাথে ছবি সংযুক্ত করা জায়েয হবে কি না?
উল্লেখ্য, ছবিটি কাপড়ে অঙ্কন করা হয় না; বরং ছবিটি কাগজে থাকে যা
কাপড়ের সাথে সেঁটে দেয়া হয়।
খ. আমি কি থ্রিপিছ কাপড়ের ব্যবসা করত পারবো?
উত্তর : ক. শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো প্রাণীর ছবি নিজে অঙ্কন করা, অন্যের মাধ্যমে অঙ্কন করানো, ছবির ব্যবসা করা, ছবিকে জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম বানানো, ব্যবসায়িক যেকোনো পণ্যের সাথে প্রাণীর ছবি ছাপানো সবগুলোই নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ।
সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত প্রয়োজনে কোম্পানীর পক্ষ থেকে থ্রিপিছের সাথে ডিজাইন স্বরূপ থ্রিপিছ পরিহিত মেয়েদের ছবি দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। তবে মাথা বিহীন শালীন ছবির মাধ্যমে ডিজাইন পেশ করা জায়েয হবে।
খ. আপনি যেহেতু ছবি অঙ্কনকারী বা ছবি সরবারহকারী নন। তাই আপনি যদি ইচ্ছাকৃত থ্রিপিছের ছবিগুলো প্রদর্শন না করেন, তাহলে থ্রিপিছ কাপড়ের ব্যবসা করতে পারবেন। আর যথাসম্ভব ছবিকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করবেন। সম্ভব হলে মার্কার পেন দিয়ে ছবিগুলোর চেহারা মুছে ফেলবেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২০১৮, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১০৯, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৯৫৩, ১২১০, মুসনাদে আহমাদ ৪/১৪১, রদ্দুল মুহতার ১/৬৪৭, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ২/৪১-৪৩)

বাচ্চু মিয়া
হাজারী বাগ, ঢাকা।

৪৪ প্রশ্ন : আমার থেকে আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব পঞ্চাশ হাজার টাকা এই শর্তে করজ নেন যে, সে আমাকে দুইটি রুমের মালিক বানিয়ে দিবে এবং দুই রুমের ভাড়া বাবদ আমাকে প্রতি মাসে ৩৮০০/- (তিন হাজার আটশত) টাকা প্রদান করবে। উক্ত শর্তে করজ গ্রহণ করা এবং আমার এভাবে করজ দেয়া বৈধ হয়েছে কি না?
উল্লেখ্য, ইমাম সাহেব যে দুই রুমের মালিক বানানোর কথা বলেছে, তার বাজার মূল্য পঞ্চাশ হাজার থেকে অনেক বেশি। তাছাড়া রুমগুলো ছয় সদস্যের যৌথ মালিকানাধীন। তিনি যে উক্ত রুমের ব্যাপারে আমার সাথে এই চুক্তি করেছেন এ সম্পর্কে অন্য সদস্যরা অবগত নয়।
উত্তর : আপনাদের চুক্তিটি বেচা-কেনার বাস্তব চুক্তি নয়। আপনি কামরা দু'টির মালিক হয়ে নিজের মত করে ব্যবহার করবেন এ চুক্তিতে তা উদ্দেশ্য নয়। বরং এটা ঋণের বিনিময়ে সুদ দেয়ার এক বাহানা মাত্র। এ ধরণের বাহানায় সুদের মত মারাত্মক হারাম জিনিস হালাল হয়ে যায় না। সুতরাং আপনি উক্ত ঋণের বিনিময়ে ইমাম সাহেব থেকে রুমের ভাড়া বা অন্য কিছুই নিতে পারবেন না। নিলে তা সুদ বলে গণ্য হবে। কারণ ঋণ দিয়ে ঋণ গ্রহিতার কাছ থেকে কোনো পর্যায়ের উপকার ভোগ করাকেই সুদ বলে। তাই আপনি ঋণ দিয়ে কোনো প্রকার উপকার ভোগ করতে পারবেন না।
উল্লেখ্য, উক্ত ইমাম সাহেবের অযৌক্তিক হিলাবাহানার আশ্রয় নিয়ে সুদের লেনদেন করা খুবই অন্যায় হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান- ১৩০, সূরা বাকারা- ২৭৭, মিশকাত; হা.নং ২৮২, রদ্দুল মুহতার ৭/৪১৩)

মু'আশারাত

আব্দুল করীম
সাতক্ষীরা, সদর।

৪৫ প্রশ্ন : ফারুক তার পিতা-মাতাকে না জানিয়ে গোপনে এক সন্তানের জননী নাজমাকে বিয়ে করেছে। তার অভিভাবক জানতে পারলে পূর্ব হতে লিখিত এক তালাকনামা তার হাতে দিয়ে বলা হয়, ঐ বৌ রাখা যাবে না, তুই তালাক দে। তখন ফারুক মুখে না বলে তালাক নামাটি পড়ে স্বেচ্ছায় তাতে স্বাক্ষর করেছে। তালাকনামায় 'আমি আমার স্ত্রী নাজমাকে তিন তালাকে বায়েন দিলাম' লেখা ছিল।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে তালাক দেয়ায় তালাক হয়েছে কি না?
উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী ফারুক সাহেব যদি বাস্তবেই তালাকনামাটি পড়ে স্বেচ্ছায় তাতে স্বাক্ষর করে থাকেন, অন্য কেউ তাকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে এ কাজে তাকে বাধ্য না করে থাকে, তাহলে এর দ্বারা তার স্ত্রী নাজমার উপর তিন তালাক পতিত হয়ে উক্ত স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। উক্ত ঘটনার পর ফারুক সাহেব নাজমার স্বামী নন এবং নাজমা ফারুকের স্ত্রী নয়। এখন তাদের দেখা সাক্ষাৎ ও স্বামী স্ত্রীসুলভ আচরণ সব কিছুই হারাম হয়ে গেছে। শরয়ী হালালা ব্যতীত উক্ত স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় সংসার করার আর কোনো উপায় নেই। এখন ফারুক সাহেবের দায়িত্ব হল, মহর পরিশোধ না করে থাকলে মহর পরিশোধ করে দেয়া। আর তার স্ত্রী নাজমা ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে। ইদ্দত হল, পূর্ণ তিনটি হায়েয যদি হায়েযা হয়ে থাকে, গর্ভবতী হলে গর্ভ প্রসব, অন্যথায় তিন মাস।
শরয়ী হালালার সূরত হল, ইদ্দত শেষে তালাক প্রদানের শর্ত করা ছাড়া স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসবে। বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক মেলামেশা হতে হবে। এরপর যদি উক্ত স্বামী তাকে তালাক দেয় বা সে মারা যায়, তাহলে পুনরায় ইদ্দত পালন করে প্রথম স্বামীর সাথে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। স্বামী মারা যাওয়ার সূরতে চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করতে হয় যদি স্ত্রী গর্ভবতী না হয়। (সূরা বাকারা- ২৩০, ২২৮, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২৬১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৪৩৩, সুনানে নাসাঈ; হা.নং ৩৪০১, ফাতহুল কদীর ৩/৩৩০, রদ্দুল মুহতার ৩/২৪৭, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৮/২৪৬)

মুহাম্মদ আব্দুল মালেক
মুহাম্মদপুর, ঢাকা

৪৬ প্রশ্ন : আমি ৭৪ বছরের একজন বৃদ্ধ। আমার স্ত্রী বিগত তিন বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেছে। আমার একটি মাত্র পুত্র সন্তান। সে সপরিবারে আমেরিকায় থাকে। আমি বর্তমানে একাকী খুব কষ্টে জীবন অতিবাহিত করছি। এই বয়সে আমার নিজের খেদমতের জন্য আমি কি আরেকটি বিয়ে করতে পারবো? এ ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালা জানিয়ে বাধিত করবেন।
উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আমাদের দেশের বদ রসম ভেঙ্গে শরীয়তের দাবী অনুযায়ী আপনার জন্য মুনাসেব পাত্রী দেখে বিবাহ করে নেয়া আবশ্যক। কারণ মানব জীবনে নিজ দীন ঈমান রক্ষা করার জন্য এবং দুনিয়াবী নানাবিধ প্রয়োজন মিটানোর জন্য বিবাহিত জীবন যাপন অত্যন্ত জরুরী। যৌবনে স্ত্রীর যতটুকু প্রয়োজন পড়ে বৃদ্ধাবস্থায় কোনো কোনো দিক দিয়ে স্ত্রীর আরো বেশি প্রয়োজন পড়ে।
সুতরাং কোনো ব্যক্তির স্ত্রীর মৃত্যু হয়ে গেলে তার নিজের এবং পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের কর্তব্য হল, তার জন্য উপযুক্ত পাত্রী দেখে বিবাহের ব্যবস্থা করা। অনেক সন্তান বাপের নিছক মানবিক প্রয়োজনের এই বিবাহে শুধু এই বাঁধ সাজে যে, তারা মনে করে নতুন ঘরে সন্তান হলে পিতার ওয়ারিশের

সংখ্যা বেড়ে যাবে, ফলে তাদের সম্পদের অংশ কমে যাবে। এ রকম ধারণা শরীয়ত বিরোধী এবং ঈমান-আকীদার সাথে সংঘর্ষপূর্ণ। এসব ধারণা পরিহার করে পিতার প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে সন্তানদেরই উচিত পিতার জন্য আরেকটি বিবাহের ব্যবস্থা করা। পিতার উপর সন্তানের ভালবাসার দাবি এটিই হওয়া উচিত। (সূরা বাকারা- ১৮৭, সূরা রূম- ২১, সূরা আ'রাফ- ১৮৯, সূরা নূর- ৩২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৪৬৯, লিসানুল আরব ১/২৮৯)

মুয্যাম্মিল খান
নরসিংদী

৪৭ প্রশ্ন : একদিন আমি আমার স্ত্রীর সাথে হাসি-ঠাট্টা করে বলেছিলাম, তোমার যদি আমাকে পছন্দ না হয় তাহলে তুমি এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দিয়ে চলে যাও। অর্থাৎ আমি তাকে বলতে চাচ্ছিলাম, তুমি আমাকে তালাক দিয়ে চলে যাও। আমার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রী আমাকে বলে, ঠিক আছে আমি তালাক দিলাম এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক।

এখন আমার প্রশ্ন হল, প্রশ্নোক্ত সূরতে স্ত্রীর দেয়া তালাক আমার উপর পতিত হয়েছে কি না? পতিত হয়ে থাকলে তাকে নিয়ে পুনরায় সংসার করার পদ্ধতি কী হবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের উপর তালাক গ্রহণের অধিকার দেয়নি। বরং স্বামীকে তালাক দেয়ার অধিকার দিয়েছে। আর স্ত্রীও স্বামীকেই তালাক দিয়েছে। সে নিজের উপর তালাক গ্রহণ করেনি। অথচ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক দেয়ার দ্বারা কোনো তালাক পড়ে না। স্বামীর দেয়া অধিকার বলে স্ত্রী নিজ নফসের উপর তালাক গ্রহণ করলেই কেবল স্ত্রী কর্তৃক তালাক গ্রহণ সম্পন্ন হয়। অন্যথায় স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। কাজেই আপনার স্ত্রী আপনাকে তালাক দেয়ায় কোনো তালাক হয়নি। আপনারা স্বামী-স্ত্রীরূপে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারেন। তবে তালাক নিয়ে এমন ঠাট্টা মশকরা করা চরম অন্যায়। এ ধরণের কাজ থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী। অন্যথায় ভবিষ্যতে অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। (রদ্দুল মুহতার ৩/২৩০, আলমউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুওয়াইতিয়্যাহ ২৯/১১, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৯/৪৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৮/৯৯, নিযামুল ফাতাওয়া ২/২১১)

উম্মে আবরার
পাইকগাছা, খুলনা।

৪৮ প্রশ্ন : আপন ভাগ্নি বা সৎ ভাগ্নির মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : যেমনিভাবে আপন বোন, ভাগ্নি এবং সৎ বোন, ভাগ্নিকে বিবাহ করা জায়েয নেই, তেমনিভাবে ভাগ্নির মেয়েদেরকেও বিবাহ করা জায়েয নেই। চাই ভাগ্নি আপন হোক বা সৎ হোক। (সূরা নিসা- ২৩, রদ্দুল মুহতার ৩/২৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৬/৪৩৭)

আখতার আলী
জাফরাবাদ, ঢাকা।

৪৯ প্রশ্ন : আমার স্ত্রী আমার দুইটি সিম নিয়ে লুকিয়ে রাখে। আমি তাকে সিমের কথা জিজ্ঞেস করলে সে অস্বীকার করে। সে বলে আমি সিম নেইনি। কিন্তু আমার তাকেই সন্দেহ হয়। এ জন্য আমি তাকে বলি, তুই যদি নিয়া থাকস তাইলে বল, আমি তালাক হইয়া যামু, সে বলে, আমি যদি নিয়া থাকি তাইলে তালাক হইয়া যামু। তার এ কথার উপরও আমার আস্থা হল না। এজন্য আমি তাকে আবার বলি, বল, আমি যদি নিয়া থাকি, দেখে থাকি বা জেনে থাকি তাহলে আমি তিন তালাক হইয়া যামু। এ কথা বলার পর সে বলেছে, যান ঠিক আছে আমি তিন তালাক।

এখন প্রশ্ন হল, এসব বলার দ্বারা তালাক হয়েছে কি না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রত্যেক বিবাহিত বা বিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য বিবাহ, তালাক এবং স্বামী স্ত্রীর হক সংক্রান্ত মাসাইল জেনে নেয়া ফরযে আইন। এ ফরযের প্রতি অবহেলা করা বড় গুনাহের কাজ। জরুরী মাসাইল না জানার কারণে দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে চরম সংকটময় অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। আর তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তিন তালাকের মত কঠিন বিষয়ে উপনীত হওয়া চরম মূর্খতা বৈ কিছু নয়।

যাই হোক, আপনার স্ত্রী যদি সিম কার্ড নিয়ে থাকে, দেখে থাকে বা সীম কার্ডের অবস্থান জেনে থাকে, তাহলে প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী আপনার স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হয়ে সে আপনার জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে গেছে। আপনি এখন ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তার খোরপোষ দিবেন এবং মহর বাকি থাকলে আদায় করে দিবেন। ইদ্দত শেষে সে অন্য যে কারো সাথে বিবাহ বসতে পারবে। আর উক্ত স্ত্রীকে নিয়ে পুনরায় সংসার করতে চাইলে শরয়ী হালালার মাধ্যমে করতে হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৩/১৮৪, আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুওয়াইতিয়্যাহ ১২/৩১১, রদ্দুল মুহতার ৩/৩৩১)

বিবিধ

সামিউল ইসলাম
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

৫০ প্রশ্ন : আমি ২০১৪ইং সালে সরকারী গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট থেকে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করি। গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউটে দুইটি ডিপার্টমেন্ট আছে। যথা,

১. গ্রাফিক ডিজাইন টেকনোলজি
২. প্রিন্টিং টেকনোলজি।

গ্রাফিক ডিজাইন টেকনোলজি: গ্রাফিক ডিজাইন টেকনোলজি থেকে পাস করে ছাত্র-ছাত্রীরা ডিজাইনার হিসেবে বিভিন্ন এ্যাড.ফার্ম, ডিজাইন হাউস, প্রেস ও বিভিন্ন কোম্পানীতে চাকুরী করে। অর্থাৎ তাদের মূল কাজ হল, ডিজাইন তৈরি করা। এই ডিজাইন তৈরি করতে গিয়ে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী বা অনেক সময় গ্রাহক যেন ডিজাইন পছন্দ করে সেজন্য বা গ্রাহককে ডিজাইনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বা ডিজাইনের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ডিজাইনের মধ্যে বিভিন্ন মানুষের ছবি বা মডেলের ছবি বা বিভিন্ন প্রাণী বা জীবজন্তুর ছবি এবং উদ্ভিদ ও আসবাব পত্রের ছবি ব্যবহার করতে হয়।

প্রিন্টিং টেকনোলজি: প্রিন্টিং টেকনোলজি থেকে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন মুদ্রণ কারখানা বা ছাপাখানা বা প্রেসে বা পত্রিকা অফিসে চাকুরী করে। অর্থাৎ তাদের কাজ হল, ডিজাইনার যা তৈরি করেছে তা মুদ্রণ করা বা ছাপানো। আর মুদ্রণ করার জন্য বা ছাপানোর জন্য হাতে এবং মেশিনে যা যা করা দরকার তা করা।

এখন আমার প্রশ্ন হল, ক. উপরোল্লিখিত কর্মস্থলসমূহের মধ্যে যে কোনোটিতে চাকুরী করা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হালাল হবে কি না? অর্থাৎ উক্ত কর্মস্থলে চাকুরী করে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি না?

খ. উল্লিখিত ডিজাইনের কাজ আমি অন্য কাউকে শিখাতে পারবো কি না? সবিস্তার জানিয়ে বধিত করবেন।

উত্তর : হালাল রিযিক অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। আর এ ক্ষেত্রে হালাল পন্থা অবলম্বন করণার্থে এ

বিষয়ে প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করা জরুরী। প্রশ্নোল্লিখিত কর্মের দু'টি দিক রয়েছে-

ক. মানুষ বা জীবজন্তুর ছবি আঁকা, তোলা, ডিজাইন করা, মুদ্রণ করা বা ছাপানো।

খ. বিভিন্ন উদ্ভিদ বা আসবাব পত্রের ছবি আঁকা, ডিজাইন করা, মুদ্রণ করা বা ছাপানো।

প্রথম দিক তথা মানুষ বা প্রাণীর ছবি আঁকা, তোলা, ডিজাইন করা, মুদ্রণ করা বা ছাপানো এসব বিষয় শিখা বা অন্যকে শিখানো শরীয়ত সম্মত কোনো ওযর ব্যতীত বৈধ নয়। এসব কাজ করে এর দ্বারা উপার্জিত অর্থও হালাল নয়।

আর দ্বিতীয় দিক তথা বিভিন্ন উদ্ভিদ ও আসবাবপত্রের ছবি আঁকা, ডিজাইন করা, মুদ্রণ করা ও ছাপানোতে শরীয়ত মতে কোনো সমস্যা নেই। এ কাজ হালাল এবং এর উপার্জিত অর্থও হালাল।

অতএব, গুনাহমুক্ত হালাল উপার্জনে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয় হল, কোনো প্রাণীর ছবি মুদ্রণ বা ডিজাইন না করে শুধু প্রাণহীন বস্তুর ছবি ডিজাইন বা মুদ্রণ করা। এভাবে চাকুরী করা সম্ভব হলে করা। অন্যথায় অন্য কোনো হালাল পন্থা বেছে নেয়া। আর বর্তমানে কেউ যদি এমন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে থাকে যেখানে প্রাণীর ছবি তোলা, ডিজাইন করা বা মুদ্রণ করতে বাধ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কোনো হালাল পেশার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ইস্তিগফারের সাথে চাকুরী করবে। হালাল পেশার ব্যবস্থা হয়ে গেলে উক্ত চাকুরী ছেড়ে দিবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৫১, ৫৯৫০, ৫৯৬২, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১০৬, শরহুল মুসলিম ৭/৭৬, রদ্দুল মুহতার ১/৬৪৭, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ৩/২১৬)

আব্দুল খালেক
কাশিমপুর, গাজীপুর।

৫১ প্রশ্ন : পানের সাথে জর্দা খাওয়ার হুকুম কি? কেউ বলে পানের সাথে জর্দা খাওয়া হারাম, কেউ বলে মাকরূহ, কেউ বলে মুবাহ। এ ব্যাপারে সঠিক মাসআলা জানতে চাই। যে ইমাম সাহেব পানের সাথে জর্দা খায় তার পিছনে নামায পড়া বৈধ হবে কি না?

পিস টিভিতে বলা হয়, যে জিনিস বেশি খেলে নেশা হয় তা কম খাওয়াও হারাম। তাই পানের সাথে জর্দা খাওয়াও হারাম। আর তারা আরো বলে থাকে, যে জিনিস খেলে অঙ্গহানী হয় তা খাওয়াও হারাম, জর্দা খাওয়ার দ্বারা ফুসফুসের ক্ষতি হয়, তাই জর্দা খাওয়া হারাম হবে। আমাদেরকে সঠিক মাসআলা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : জর্দা খাওয়া মূলত মুবাহ। আর যদি জর্দা শরীরের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়, তাহলে তা খাওয়া মাকরূহ হবে। যে ইমাম পানের সাথে জর্দা খায় তার পিছনে নামায পড়তে কোনো সমস্যা নেই। যারা জর্দা খাওয়াকে হারাম বলেছে তাদের কথা ঠিক নয়। জর্দা বেশি খেলে নেশা হওয়ার কথা ঠিক নয়। ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্যকারী জ্ঞান বিকারগ্রস্ত হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হওয়াকে নেশা বলে। আর জর্দার কোনো মাত্রাতেই এই অবস্থা সৃষ্টি হয় না। অতএব, জর্দা বেশি পরিমাণে খেলে নেশা সৃষ্টি হয় এই কথা বলা ঠিক নয়। তবে জর্দা বেশি খাওয়া বা বারবার খাওয়া বদঅভ্যাস। বদঅভ্যাস আর নেশা এক জিনিস নয়। আর জর্দা খাওয়ার দ্বারা ফুসফুসের ক্ষতি হওয়া না হওয়া এটা শারীরিক বিষয়। শুধু এর উপর ভিত্তি করে কোনো জিনিসকে হারাম ফতওয়া দেয়া মুর্খতা বৈ কিছু নয়। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪০৮৭, ৫৫৮৫, উমদাতুল কারী ১৪/৫৮৪, রদ্দুল মুহতার ১/১৪৪, আলআশবাহ ওয়ান নাযায়ের; পৃষ্ঠা ৬৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১৬/১৪১)

হাফেজ হেদায়াতুল্লাহ
রংপুর।

৫২ প্রশ্ন : মুহতারাম! আমাদের এলাকায় প্রায় ২/৩ যুগ পূর্ব থেকে একটি ফুরকানিয়া মাদরাসা চালু আছে। এলাকার মুরুব্বীগণ মাদরাসার জমি বাদেও আরো অনেক ফসলী জমি মাদরাসার উন্নয়নের জন্য ওয়াকফ করে গেছেন। এলাকায় মসজিদ না থাকায় মুসল্লীগণ ফোরকানিয়া মাদরাসার ঘরেই ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করতেন। এক পর্যায়ে নামায পড়ানোর জন্য ইমাম মুয়াযযিনও নিয়োগ দেয়া হয়। ইমামতি মুয়াযযিনীর পাশাপাশি তারা ফোরকানিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতার দায়িত্বও পালন করতেন। আর তারা বেতন বাবদ মাদরাসার ওয়াকফকৃত জমি ভোগ করতেন। বর্তমানে মুসল্লী বেড়ে যাওয়ায় এবং জামে মসজিদের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় এলাকাবাসী ও মসজিদ কমিটির সম্মতিতে মাদরাসার ওয়াকফকৃত একটি ফসলী জমি বিক্রয় করে বিক্রয় লব্ধ টাকা দিয়ে মাদরাসার নামে একটি জায়গা ক্রয় করা হয়। অতঃপর সে জায়গাটি মসজিদ নির্মাণের জন্য দান করা হয়। আর অবশিষ্ট টাকা মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয় করা হয়। বর্তমানে নির্মাণ ফান্ডে সংকট দেখা দেয়ায় মাদরাসার ওয়াকফকৃত কিছু জমি বন্ধক রেখে বন্ধক গ্রহীতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে
নির্মাণ কাজ চলছে। এখন প্রশ্ন হল,

(১) এভাবে মাদরাসার নামে ওয়াকফকৃত জায়গা বিক্রয় করে মাদরাসার জন্য অন্য জমি ক্রয় করা অতঃপর উক্ত জমি মসজিদ নির্মাণের জন্য দান করা ও অবশিষ্ট টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ হয়েছে কি?

(২) না হয়ে থাকলে মসজিদ কমিটি ও এলাকাবাসীর জন্য বর্তমানে করণীয় কী হবে?

(৩) মসজিদ কমিটি যদি মাদরাসার বিক্রিকৃত সমমানের সমপরিমাণ জমি ক্রয় করে মাদরাসার নামে ওয়াকফ করে দেয় কিংবা মাদরাসার সেই জমির বিক্রয় মূল্য মাদরাসার ফান্ডে জমা দেয়, তাহলে ক্ষতিপূরণ আদায় হবে কি না?

(৪) মাদরাসার ওয়াকফকৃত জমি বন্ধক দিয়ে বন্ধকের টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ কাজ বৈধ হবে কি না?

(৫) উক্ত কাজগুলো যদি নাজায়েয হয় এবং তারপরও মসজিদ কমিটি এর কোনো সমাধান না করে, তাহলে উক্ত মসজিদে জুম'আ, ইতিকাফ ও অন্যান্য নামায আদায়ের হুকুম কি?

(৬) ইমাম ও মুয়াজ্জিনের জন্য বেতন বাবদ মাদরাসার ওয়াকফকৃত ফসলী জমি ভোগ করা জায়েয আছে কি না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : (১) প্রশ্নে বর্ণিত ফোরকানিয়া মাদরাসার জন্য ওয়াকফকৃত ফসলী জমিটি বিক্রি করে অন্য জমি ক্রয় করে তা মসজিদ নির্মাণের জন্য দান করা এবং অবশিষ্ট টাকা মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয় করা কোনোটিই বৈধ হয়নি। বরং এলাকাবাসীর উচিত ছিল, নিজস্ব অর্থায়নে মসজিদের জন্য ভিন্ন জমি ক্রয় করে তাতে মসজিদ নির্মাণ করা। কেননা শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া ওয়াকফকৃত জমি বিক্রি করা নাজায়েয। এর বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হয়। সুতরাং ক্রেতাকে তার টাকা ফেরত দিয়ে মাদরাসার নামে ওয়াকফকৃত জমি মাদরাসার ব্যবহারে ফিরিয়ে আনতে হবে।

(২), (৩) বাতিল বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দ্বারা আরেকটি জমি ক্রয়

করাও সহীহ হয়নি। আর এ অবস্থায় উক্ত জমির উপর মসজিদ নির্মাণ করাও সহীহ হচ্ছে না। তবে এখন যদি চাঁদা তুলে মাদরাসার জমির মূল্য ফেরত দিয়ে মাদরাসাকে তার জমি বুঝিয়ে দেয়, আর মসজিদের উদ্দেশ্যে মাদরাসার নামে ক্রয় করা জমিটি মসজিদের নামে রেজিস্ট্রি করে নেয় এবং তাতে মসজিদ নির্মাণ করে নামায শুরু করে তাহলে উক্ত মসজিদ শরয়ী মসজিদ বলে পরিগণিত হবে।

(৪) মাদরাসার ওয়াকফকৃত জমি বন্ধক রেখে বন্ধকের টাকা মসজিদের নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা বৈধ হবে না। কেননা ওয়াকফকৃত সম্পত্তি যেমনিভাবে বিক্রি করা যায় না, তদ্রুপ তা বন্ধকও রাখা যায় না। সুতরাং উক্ত জমি অবশ্যই ফিরিয়ে নিতে হবে এবং ঋণদাতা জমি ব্যবহার করে থাকলে উক্ত দিনগুলোর নায্য ভাড়াও আদায় করতে হবে। তাছাড়া প্রচলিত বন্ধকের লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদী লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত। তাই যারা এই বন্ধকের কাজ করেছে তাদের তওবা করাও জরুরী।

(৫) এখন মসিজদ কমিটির দায়িত্ব হল, যত দ্রুত সম্ভব উপরে বর্ণিত পন্থায় উক্ত সমস্যার সমাধান করা। সমাধান করা থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই। কারণ সমাধান না করলে উক্ত মসজিদে নামায, ইতিকাফ ইত্যাদি মাকরূহ হবে।

(৬) কোনো মসজিদ যদি মাদরাসার প্রয়োজনে নির্মাণ করা হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত মসজিদে ইমাম-মুআযযিনের জন্য বেতন হিসেবে মাদরাসার ওয়াকফকৃত ফসলী জমি ভোগ করা জায়েয আছে; অন্যথায় নয়। (রদ্দুল মুহতার ৬/৫৪০, ৬৮৩, আলবাহরুর রায়েক ৫/৩৪৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩/৩৮, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১৪/১৩৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২২/৬৫, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯/১৭৯)

উসামা

পাইকগাছা, খুলনা।

৫৩ প্রশ্ন : আমার ভাই পাকিস্তানে থাকতেন। গত রমাযানের এক সন্ধ্যায় হঠাৎ শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু লোক এসে আমার ভাইসহ আরো কয়েক জনের উপর গুলি ছোড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই আমার ভাই এবং আরেকজন বাংলাদেশী আলেম শহীদ হয়ে যান। তারা কোনো কথা বলারও সুযোগ পাননি এবং কোনো চিকিৎসাও পাননি।

(৩২ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

(নবীজীর নামায; ৩৪ নং পৃষ্ঠার পর)

উদাহরণত হযরত শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর সুযোগ্য পুত্র আওলাদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাওলানা আসআদ মাদানী রহ. বলেন, 'এ কিতাবে পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এর দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা যে সব বিভ্রান্তি ছড়িয়ে থাকে তার স্বরূপ বোঝাও সহজ হবে। তাই ব্যক্তিগত অধ্যয়নের পাশাপাশি মসজিদে জামা'আতের পর আগত মুসল্লীদেরকে দু'একটি আয়াত বা হাদীস পড়ে শুনিয়ে দিলে তা ইলম ও বরকতের কারণ হবে। আর ছাত্রদেরকে এই কিতাবের দলীলগুলো মুখস্থ করিয়ে দেয়া উচিৎ।'

প্রখ্যাত আলেমে দীন ইদারা তাবলীগুল ইসলাম সাদেকাবাদের ইদরীস আনসারী সাহেব বলেন, 'কিতাবটি ইলম পিপাসু বন্ধুদের সংগ্রহে রাখার মত। বিশেষত হানাফী মাযাহাবের অনুসারীদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান উপহার। এমনকি গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরাও যদি সত্যান্বেষী মন নিয়ে কিতাবটি অধ্যয়ন করেন তাহলে তাদের কাছেও সঠিক বিষয় অস্পষ্ট থাকবে না ইনশাআল্লাহ। কিতাবটি দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিসাবভুক্ত হওয়া উচিৎ।

এছাড়া মসজিদে নববীর সাবেক মুদাররিস ড. সাইয়েদ শের আলী শাহ ও জামি'আ আশরাফিয়া লাহোরের সম্মানিত শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল মালেক কান্ধলভী এবং বৃটেনের ইসলামিক শরীয়া কাউন্সিলের প্রধান, গ্লাসগো স্কটল্যান্ডের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতীব মুফতী মাকবুল আহমদসহ আরো অনেকেই এ কিতাবের ব্যাপারে তাদের চমৎকার অভিমত পেশ করেছেন।

গ্রন্থকার কিতাবের টীকায় কোথাও কোথাও শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, যা আলেম ও তালিবে ইলমের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

এ বিষয়ে আরো কিছু উপকারী কিতাব

আলোচ্য কিতাবটি ছাড়াও বাংলা ভাষায় সহীহ হাদীসের আলোকে নামায শেখার নির্ভরযোগ্য লিখিত কিংবা অনূদিত আরও কিতাব রয়েছে। পাঠকের উপকারার্থে তার কয়েকটির নাম দেয়া হল।

১. *দলীলসহ নামাযের মাসায়েল*। লেখক, মাওলানা আব্দুল মতিন। মুহাদ্দিস, জামি'আতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা।

২. *হাদীস ও সুন্নাহয় নামাযের পদ্ধতি*। লেখক, মাওলানা আব্দুল মালেক। আমীনুত তা'লীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা।

৩. *তোহফায়ে আহলে হাদীস* (বাংলা)। মূল, শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ.। সহজীকরণ ও বিন্যাস, মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা.বা. ও মাওলানা আমীন পালনপুরী দা.বা.।

৪. *হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*।

৫. *তুহফাতুল হাদীস*। উভয় কিতাবই জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার সম্মানিত শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক দা.বা. কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত।

৬. *কুরআন-হাদীসের আলোকে হানাফীদের আমলের সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ*।

৭. *যুগে যুগে আহলে হাদীস*। উভয় কিতাব জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার মুহাদ্দিস মুফতী মীযানুর রহমান কাসেমী কর্তৃক সংকলিত ও প্রধান মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. কর্তৃক সম্পাদিত।

৮. *সহীহ হাদীসের আলোকে নামায*। লেখক, মাওলানা হাসান সিদ্দীকুর রহমান। উস্তায, উলূমুল হাদীস বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া ঢাকা। সম্পাদনা: মাওলানা আব্দুল মালেক দা.বা. (আমীনুত তা'লীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া)।

৯. *মাযহাব বিরোধীদের স্বরূপ সন্ধানে*। এটি জামি'আ শরইয়্যাহ মালিবাগ হতে ১৪২৫-২৬ হিজরী শিক্ষাবর্ষের দাওরায়ে হাদীস সমাপনকারী ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক সংকলিত। সম্পাদনা পরিষদ, মাওলানা আব্দুল মতিন, মাওলানা আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম, মাওলানা আবূ সাবের আব্দুল্লাহসহ আরো অনেকে।

১০. *আহলে হাদীসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ*। লেখক, মাওলানা রুহুল্লাহ নোমানী।

লেখক: মুহাদ্দিস, জামি'আ বাইতুল আমান মিনার মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

মাতৃজাতি

মহিলাদের দীনী শিক্ষার গুরুত্ব ও পদ্ধতি

মাওলানা আনওয়ারুল হক

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ঈমান ও আমলের দায়িত্ব দিয়েছেন। ঈমান ও আমল বিষয়ে জানতে হলে ইলমে দীন হাসিল করা অপরিহার্য। ইলম বলা হয় কুরআন-হাদীসের কথা এবং মাসআলা মাসাইল সম্পর্কিত জ্ঞানকে। ইলম না থাকলে আমল করা সম্ভব হয় না। সহীহভাবে মাসআলা-মাসাইল শিক্ষা না করলে সহীহ-শুদ্ধভাবে আমল করা যায় না। আর আমল সহীহ-শুদ্ধভাবে না হলে আল্লাহর নিকট তা গ্রহণযোগ্য হয় না। এ জন্য দীনের প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

طلب العلم فريضة على كل مسلم

অর্থ : সকল মুসলমান নর-নারীর উপর ইলম শিক্ষা করা ফরয। ইবনে মাজাহ; হা.নং ২২৪)

প্রয়োজন পরিমাণ ইলম বলতে বোঝায়, একজন মানুষের দীনের উপর চলতে যতটুকু জ্ঞান দরকার তা শিক্ষা করা। যেমন ঈমান, আকীদা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির জ্ঞান। সেই সাথে দৈনন্দিন জীবনে যে সব লেনদেন ও কায়-কারবার করতে হয় সে সবের মাসআলা-মাসাইল ও নিয়ম-কানুন জানাও ফরয। সুতরাং ব্যবসায়ীর জন্য তার চাকুরী সংক্রান্ত মাসআলা-মাসাইল জানা ফরয। গৃহিণীর জন্য সন্তান প্রতিপালন, স্বামীর খেদমত প্রভৃতির মাসআলা-মাসাইল জানা ফরয। এভাবে প্রত্যেক পেশা ও কর্মজীবির জন্য নিজ নিজ পেশা ও কর্ম সম্পর্কিত মাসআলা-মাসাইল জানা ফরয। যদি কোন নর বা নারী এসব শিক্ষা না করে তাহলে তার ফরয তরক করার গুনাহ হবে।

দীনী ইলম হাসিল করার ফযীলত

ইলম যেহেতু আমলের বুনিয়াদ এবং তা শিক্ষা করতে মেহনতও হয় তাই ইলম শিক্ষা করার সওয়াবও অনেক বেশি। নফল ইবাদতের চেয়ে ইলম শিক্ষা করার ফযীলত বেশি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. এবং হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. হাদীস বর্ণনা করেছেন, দীনী ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা এক হাজার রাকাআত নফল নামায পড়ার চেয়ে বেশি ফযীলত রাখে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা. নং ২১৯) কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

অর্থ : 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ঈমানদার ইলমওয়ালার মর্যাদা অনেক উঁচু করে দেন। (সূরা মুজাদালাহ-১১)

কত উঁচু করে দেন সেটা আল্লাহ তা'আলা বলেননি। হতে পারে তাদের মর্যাদা এত উঁচু করে দেন যা আমাদের কল্পনায়ও আসবে না। তাই সীমা নির্ধারণ না করে বলা হয়েছে অনেক উঁচু করে দেন। ইলমের কারণেই আলেমকে জাহান্নামের উপযুক্ত নাফরমান মুসলমানদের ব্যাপারে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে। তাদের সুপারিশে আল্লাহ পাক ঐ পাপীদের নাজাতের ফয়সালা করে দিবেন।

দীনী ইলম হাসিল করার আদব

দীনী ইলম হাসিল করার পূর্বে নিয়ত ঠিক করে নিতে হবে। প্রথমত, এই নিয়ত করবে যে, আমি ইলম মোতাবেক আমল করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য ইলম হাসিল করছি। কারণ ইলম অনুযায়ী আমল না করলে ইলমের কোন ফযীলত থাকে না। যাদের ইলম আছে আমল নেই তাদের সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

كمثل الحمار يحمل اسفارا.

অর্থ : তারা হল ঐ গাধার মত যার পিঠে এক বোঝা কিতাব রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, গলদ নিয়ত দিল থেকে বের করে দিতে হবে। সুতরাং তর্কে বিজয়ী হতে পারব, জ্ঞানের বড়াই দেখাতে পারব, মানুষের কাছে সম্মান পাব এসব নিয়তে ইলম হাসিল করা যাবে না। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

من طلب العلم ليمارى به السفهاء اوليباهى به العلماء اوليصرف وجوه الناس اليه فهو فى النار.

অর্থ : যে ব্যক্তি মূর্খদের সঙ্গে তর্ক করা, আলেমদের সাথে অহংকার করা কিংবা নিজের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার নিয়তে ইলম শিক্ষা করবে সে জাহান্নামে যাবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ২৫২)

তৃতীয়ত, এই নিয়তে ইলম হাসিল করবে যে, ইলম অর্জন করে তা অপরকে শিক্ষা দিব এবং সে অনুযায়ী আমল করার জন্য অন্যকে দাওয়াত দিব।

দীনী ইলম হাসিল করার পদ্ধতি

সাধারণত তিন তরীকায় ইলম হাসিল করা যায়। **(এক)** ইলম হাসিল করার সবচেয়ে উত্তম তরীকা হল, কোন উস্তাদ থেকে ইলম শিক্ষা করা। মেয়েরা বালেগা হলে কোন গাইরে মাহরাম (যার সাথে দেখা দেয়া জায়েয নয়) পুরুষের সামনে গিয়ে ইলম হাসিল করতে পারবে না। এতে ইলম হাসিল করার সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে। বালেগা নারী কোন মাসআলা-মাসাইল শিখতে হলে ভাই, পিতা, স্বামী, পুত্র প্রমুখ মাহরাম ব্যক্তিবর্গ থেকে জেনে নিবে। তাদের জানা না থাকলে তারা কোন আলেম থেকে শিখে এসে তাদেরকে শিখাবে। কোন বিজ্ঞ আলেমা বা মহিলা আলেম পাওয়া গেলে তাদের থেকেও ইলম শিক্ষা করা যাবে।

(দুই) ইলম হাসিল করার আরেকটি পদ্ধতি হল, দীনী কিতাব-পত্র পাঠ করে ইলম হাসিল করা। কিতাব বা বই-পত্র পাঠ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে-

দীনী বিষয় শিক্ষা করার উদ্দেশ্যে কোনো কিতাব পাঠ করতে হলে যে কোন কিতাব পেলেই বা যে কোন কিতাবের নাম শুনেই তা পাঠ করা যাবে না। বাজারে ধর্মীয় নামে অনেক

ধরণের কিতাব পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে এই সব কিতাবই নির্ভরযোগ্য নয়। তাই যে কোন কিতাব পাঠ করতে হলে সর্বপ্রথম জেনে নিতে হবে সেই কিতাবের লেখক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কি না। তিনি হক্কানী বা জ্ঞানী লোক কি না। কোনো অভিজ্ঞ আলেমের নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে সেই কিতাব সকলের পাঠযোগ্য কি না। নির্ভরযোগ্য নয় এ রকম কিতাব-পত্র পাঠ করলে হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী আসতে পারে।

দুনিয়াতে সত্য ধর্ম ইসলাম ছাড়াও বহু বাতিল ধর্ম রয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য সেসব ধর্মের কিতাব-পত্র পাঠ করা জায়েয নয়। যেমন ইয়াহুদীদের তাওরাত, খ্রিস্টানদের ইঞ্জিল বা বাইবেল, হিন্দুদের বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, গীতা ইত্যাদি। শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞ না হয়ে এসব গ্রন্থ পাঠ করলে হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী আসতে পারে।

দুনিয়াতে অনেক ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদের লিখিত বই-পত্র পাঠ করাও ঠিক নয়। এতেও হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী আসতে পারে। অনেকে এসব বই পাঠ করার পক্ষে যুক্তি দিয়ে থাকেন যে, 'আমরা পড়ে পড়ে শুধু ভালোটা গ্রহণ করব আর মন্দটা পরিত্যাগ করব। এতে অসুবিধা কী?' তাদের এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাধারণ মানুষের মধ্যে দীনী বিষয়ে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ তা সঠিকভাবে বিচার করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। ফলে মন্দটাকে ভালো মনে করে গোমরাহীর শিকার হয়ে যেতে পারে। তাই বিজ্ঞ আলেমা নয় এমন সাধারণ মহিলাদের জন্য এ জাতীয় বই-পত্র পাঠ করা জায়েয নয়।

কিতাব-পত্র পাঠ করে কোনো বিষয় সন্দেহযুক্ত হলে বা অস্পষ্ট মনে হলে কিংবা ভালোভাবে বুঝতে না পারলে বার বার পড়ে সেটা পরিষ্কার করে নিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বিষয় পরিষ্কারভাবে বুঝে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত বার বার সেটা পড়তে থাকতে হবে। উস্তাদ থাকলে উস্তাদকে জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট করে নিতে হবে। তারপরও বুঝে না আসলে দীনী ইলম সম্বন্ধে বিজ্ঞ আলেম বা আলেমা থেকে বুঝে নিতে হবে। ভালোভাবে না বুঝে সেটা বর্ণনা করা যাবে না।

অনেক মহিলা অশ্লীল উপন্যাস, নভেল, নাটক, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এ জাতীয় বই-পত্র পাঠ করা নিষেধ। এসব পাঠ করলে আল্লাহর দেয়া মূল্যবান সময় অপচয় করার গুনাহ হয়। উপরন্তু এতে চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

কারও যদি এসব বই পড়ার নেশা হয়ে থাকে তাহলে যত কষ্টকরই হোক, আল্লাহ তা'আলার ভয়ে মনের চাহিদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কিছুদিন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ জাতীয় বই-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। এগুলো নিজের আশেপাশেও রাখবে না। একেবারে দূরে সরিয়ে দিবে বা পুড়িয়ে ফেলবে। চেষ্টা করে কিছুদিন এভাবে বিরত থাকতে পারলেই মন থেকে এসব পাঠ করার চাহিদা দূর হয়ে যাবে।

পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন: চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা করার বৈধতা-অবৈধতা নিয়তের উপর নির্ভর করে। এগুলো যদি দীনের সহযোগিতা, মানুষের কল্যাণ ও সৃষ্টিজীবের সেবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় তাহলে তা বৈধ। আর যদি অসৎ পন্থা অবলম্বন ও শোষণ-জুলুমের মাধ্যমে অর্থ হাতানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে কুরআন-হাদীসের মূলনীতির আলোকে তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রচলিত সহশিক্ষা ব্যবস্থায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হতে হলে মেয়েদের পক্ষে পরপুরুষের সঙ্গে পর্দাহীনভাবে ওঠাবসা ছাড়া সম্ভব হয় না। অথচ পর্দা রক্ষা করা ফরয। পর্দার বিধান রক্ষা না করে এগুলো তো দূরের কথা, শরীয়তে দীনী শিক্ষা অর্জন করারও অনুমতি নেই।

(তিন) ইলম হাসিল করার তৃতীয় পদ্ধতি হল, ওয়ায-নসীহত বা দীনী আলোচনা শুনে ইলম হাসিল করা। তবে কোনো ওয়ায মাহফিলে বা তা'লীমের মজলিসে শরীক হতে গিয়ে পর্দার ব্যাঘাত ঘটলে বা কোনো রকম ফেতনার আশঙ্কা থাকলে সেরূপ ওয়াযের মাহফিলে বা তা'লীমের মজলিসে যাওয়া জায়েয হবে না।

মেয়েদের দীনী শিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্থানে সৎ, জ্ঞানী, গুণী, নেককার ও পরহেযগার মহিলার মাধ্যমে মহিলা-তা'লীমের মজলিস পরিচালিত হয়ে থাকে। পর্দা রক্ষা করে এরূপ মজলিসে তা'লীম গ্রহণ করতে পারলে অনেক উত্তম। তা'লীম দাতা মহিলা জ্ঞানী না হলে সেখানে না যাওয়া উচিৎ।

ওয়ায-নসীহতের মজলিস এবং তা'লীমের মজলিস দীনী মজলিস। তাই এরূপ মজলিসে গেলে মজলিসের আদবও রক্ষা করতে হবে।

লেখক: শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

লেখা আহ্বান

উলামায়ে কেরাম, প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক বিশেষত আবনায়ে রাহমানিয়া ও রাবেতা লেখক ফোরামের খিদমতে রাবেতার পক্ষে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। রাবেতার নিয়মিত বিভাগসহ দীন ও উম্মাহর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে লেখা পাঠানো যাবে।

শর্তাবলী

- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও মাসলাকে দেওবন্দের অনুকূল হতে হবে।
- সমসাময়িক বিষয় সংক্রান্ত লেখা অগ্রাধিকার পাবে।
- ফুলস্কেপ সাদা কাগজে পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।
- সম্পাদনার ক্ষেত্রে রাবেতার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।
- অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হবে না।
- রাবেতার ই-মেইলে, ডাকযোগে অথবা সরাসরি রাবেতার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে লেখা জমা দেয়া যাবে।

বি.দ্র. 'পাঠক মন্তব্য' কলামে পাঠকের মতামত / পরামর্শ / গঠনমূলক সমালোচনা পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।

-কর্তৃপক্ষ

ইলমে দীন অর্জনের জরুরী শর্তাবলী

মুফতী হিলালুদ্দীন গাজীপুরী

ইলম অমূল্য সম্পদ। ইলম জাতির মেরুদণ্ড। ইলম অর্জন ছাড়া কোন জাতি কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সাধন করতে পারে না। এজন্য শরীয়তে মুহাম্মাদী প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইলম অর্জন করাকে ফরয করেছে। হাদীসে এসেছে, طلب العلم فريضة على كل مسلم. অর্থ: ইলম অর্জন করা প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য।

বর্তমানে পৃথিবীতে দু' প্রকার ইলম (শিক্ষা) চালু রয়েছে। একটি হল মানবরচিত শিক্ষা, অপরটি হল ইলমে ইলাহী। মানবরচিত শিক্ষা মানুষের নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেক ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত। বয়সের ভিন্নতায় যেমন বুদ্ধির পার্থক্য হয় তেমন মানুষভেদেও বুদ্ধির তারতম্য হয়। অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধি স্থিতিশীল নয়। সুতরাং অস্থিতিশীল বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল শিক্ষা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তি ও জাতির বিপর্যয়ের কারণও হয়ে থাকে।

ইলমে ইলাহী : আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা যা তিনি নবী রাসূলগণকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন আর তার বাস্তব প্রয়োগ আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম মানুষকে দেখিয়েছেন। কওমী মাদরাসায় এই ইলমে ইলাহীই শিক্ষা দেয়া হয় এবং হাদীসে এই শিক্ষা অর্জনকেই ফরয বলা হয়েছে। বস্তুত এই ইলমই প্রকৃতপক্ষে জাতির মেরুদণ্ড। কারণ যে ইলম মানুষকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয় সেটাই হল প্রকৃত ইলম। আর যে ইলম এমন নয় তা ইলমই নয়। কাজেই তালিবে ইলম ভাইদেরকে খুব গুরুত্ব দিয়ে ও মেহনত করে ইলমে দীন অর্জন করতে হবে। যাতে এর মাধ্যমে সে তার মাওলা ও মুনিব পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

ইলম অর্জন করার জন্য অন্তরে ইলমের প্রতি তলব ও আগ্রহ থাকতে হবে। সর্বদা শুধু ইলমেরই চিন্তা থাকতে হবে। সত্যিকার তলব ছাড়া ইলম আসবে না। আর ইলমে ইলাহী অর্জন করার জন্য তালিবে ইলমকে জরুরী ভিত্তিতে কিছু শর্ত মেনে চলতে হবে।

প্রথম শর্ত: ইখলাসে নিয়্যত

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিৎ যে, এর দ্বারা যেন আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত হুকুম অনুযায়ী আমল হয়। গাফেল লোকদের গাফলত দূর করা হয় এবং গোমরাহীর মূল উৎপাটিত হয়। যে ইলম এ উদ্দেশ্য ছাড়া অর্জন করা হবে তা নাজাতের মাধ্যম হবে না; বরং তা তার উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয় শর্ত: আত্মশুদ্ধি

ইখলাসে নিয়্যতের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, তালিবের ইলমের অন্তর থেকে বদ আখলাক দূর করা ও উত্তম গুণাবলী দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করা। কারণ যে ঘরে কুকুর থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না অনুরূপ যে অন্তরে বাতেনী কুকুর অর্থাৎ বদ আখলাক থাকে সে অন্তরেও ইলম প্রবেশ করে না।

তৃতীয় শর্ত: বিনয় ও নম্রতা

তালিবে ইলমের জন্য বিনয়ী ও নম্র হওয়াও জরুরী। কেননা নম্রতা অবলম্বনের পরই মর্যাদা লাভ হয়। হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে,

من تواضع لله رفعه الله.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমি শিক্ষা জীবনে নিজেকে খুব ছোট করে রেখেছি। যে কারণে শিক্ষক জীবনে খুব ইজ্জত-সম্মান পেয়েছি।

চতুর্থ শর্ত: উস্তাদকে সম্মান করা

তালিবে ইলমের জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরী হল, উস্তাদের আদব-সম্মান রক্ষা করা। ছাত্রের আচরণ-উচ্চারণ দ্বারা উস্তাদ কষ্ট পেলে ছাত্র ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। তালিবে ইলমের জন্য উচিৎ, সে যেন উস্তাদের সামনে কোন প্রকার আমিত্ব ও অহংকার প্রকাশ না করে; সর্বদা বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে।

পঞ্চম শর্ত: নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন

নির্ভেজাল যোগ্যতা ও ইলমের উন্নতির জন্য নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন অত্যন্ত জরুরী। মহাজ্ঞানী জালিনুসকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কীভাবে অন্যান্য সাথী-সঙ্গীর চেয়ে বেশি জ্ঞান অর্জন করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, তারা শরাব পান করার পেছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে আমি কিতাব অধ্যয়নের জন্য চেরাগের পেছনে তার চেয়ে বেশি ব্যয় করেছি। এ ঘটনা থেকে সহজেই অধ্যয়নের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। তালিবে ইলমের জন্য উচিৎ, মুতালা'আর সময় কাগজ কলম সঙ্গে রাখা এবং নতুন কোন বিষয় আসলে তা সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখা। বর্ণিত আছে, قيدوا العلم بالكتابة অর্থাৎ তোমরা ইলমকে লেখনীর মাধ্যমে আবদ্ধ কর। তবে শুধু লেখার উপর ভরসা করা যাবে না; বরং যা কিছু লেখা হয় তা অন্তরেও হেফাযতের চেষ্টা করবে।

ষষ্ঠ শর্ত: তাকরার করা

ইলম অর্জন করার জন্য তাকরারও (সহপাঠির সঙ্গে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি)অনেক জরুরী বিষয়। এর দ্বারা ইলম পাকাপোক্ত হয়। কাজেই সবকের চেয়ে তাকরার-মুতালা'আ বেশি হওয়া চাই।

সপ্তম শর্ত: সময়ের হেফাযত

তালিবে ইলমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সময়ের সঠিক মূল্যায়ন করা, সময়কে পুরোপুরি কাজে লাগানো। উপরন্তু من حسن اسلام المرأ تركه ما لا يعنيه (ইসলামের সৌন্দর্য হল, অনর্থক বিষয়াদি পরিহার করা)এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রেখে অনর্থক কথা-বার্তা ও বেহুদা কাজ-কর্ম ছেড়ে দেয়া উচিৎ। তালিবে ইলম জরুরী কাজ-কর্ম ছাড়া অন্য কাজে সময় লাগাবে না এবং এমন কোন কাজে সময় ব্যয় করবে না যা ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে

(৩৭ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

কিশোর প্রতিভা

ইলম ও সম্মান

হিজরী প্রথম শতাব্দী। যিলহজ্জ মাসের কোন একদিন। প্রিয়তম ঘর 'বাইতুল্লাহ'-এর প্রাঙ্গণ। অগণন মানুষের ভিড়ে আজ তা তরঙ্গায়িত। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢলের মত ছুটে আসছে মানুষ। সবার মুখে 'লাব্বাইক,লাব্বাইক' গুঞ্জন-ধ্বনি। ঐ যে তাওয়াফ করছেন খলীফা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক। পেছনের দু'জন তারই দুই পুত্র। লকলকিয়ে বেড়ে ওঠা ঘাসের মতোই সতেজ-সজীব। তাওয়াফ শেষে খলীফা এগিয়ে গেলেন নামাযরত এক ব্যক্তির দিকে, যিনি কখনো দীর্ঘ রুকুতে কখনো দীর্ঘ সেজদায় প্রভুর প্রেমে সিক্ত হচ্ছেন। তার পেছনে, ডানে, বায়ে প্রতীক্ষমান বহু মানুষ। এদের সঙ্গে খলীফাও বসে পড়লেন। একেবারে সবার পেছনে, যেখানে গিয়ে মজলিস শেষ হয়েছে। পুত্রদ্বয়কেও তিনি সঙ্গে বসালেন। তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, কে ইনি? যার জন্য স্বয়ং খলীফা জনতার কাতারে প্রতীক্ষা করছেন!

নামায শেষ হল। প্রতীক্ষমান জনতার দিকে তিনি ফিরে তাকালেন। খলীফা সালাম দিয়ে নিজেই তার দিকে অগ্রসর হলেন। কুশল বিনিময়ের পর অনুমতি চেয়ে কোন বিশেষ মাসআলাও জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও উত্তর দিলেন সম্ভাব্য সকল প্রশ্নের সব পথ বন্ধ করে। জনতা অভিভূত হল। খলীফাও 'জাযাকাল্লাহ খাইরান' বলে শুকরিয়া জানালেন। কিছুক্ষণ পর নকীব ঘোষণা করল, 'শোন হে জনমণ্ডলী! এ অঞ্চলের একমাত্র মুফতী আতা ইবনে আবী রাবাহ। তার অনুপস্থিতিতে ইবনে আলী নাজাহ। এছাড়া আর কেউ এখানে ফতওয়া প্রদান করতে পারবে না।' ঘোষণা শুনে খলীফাপুত্র জিজ্ঞেস করল, তাহলে আমরা কেন সে লোকটির কাছে গেলাম, খলীফার প্রতি যার সম্মান ও উপযুক্ত মর্যাদাবোধ নেই! খলীফা বললেন, বেটা! এই যে মানুষটিকে তুমি দেখলে এবং যার অসামান্য মর্যাদার কারণে স্বয়ং খলীফাকেই তার কাছে এগিয়ে আসতে হল, তিনিই হলেন মসজিদুল হারামের প্রধান মুফতী আতা ইবনে আবী রাবাহ। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর পর তিনিই এ মহান মসনদের যথার্থ উত্তরসূরী।

তারপর খলীফা আবেগঘন কণ্ঠে বললেন, বৎসরা! ইলম হাসিল কর। ইলমের পরশে তুচ্ছ মানুষও মহান সত্তায় পরিণত হয়, নাম পরিচয়হীন অখ্যাত ব্যক্তিও আরোহন করে খ্যাতির শীর্ষে আর ক্রীতদাসও বনে যায় রাজা বাদশাহর মত উচ্চ মর্যাদাবান।

সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিকের কথাগুলো অতিরঞ্জিত নয়। স্বয়ং আতা ইবনে আবী রাবাহ-ই তো শৈশবে ছিলেন এক মহিলার ক্রীতদাস। তারপর এই ইলমেরই বদৌলতে তিনি আরোহন করেছেন মর্যাদার শীর্ষ চূড়ায়।

হাসান আব্দুল্লাহ
তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা

উপজাতি নওমুসলিমাদের সঙ্গে একদিন

২০১৩ সনের কথা। ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে রাহমানিয়া মাদরাসায় নওমুসলিমদের একটি জামা'আত এসেছিল। রাঙ্গামাটির প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাদের বসবাস। সেখানে খাদ্য-পানীয়ের খুব অভাব। পানির একমাত্র ব্যবস্থা পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্না। আর খাবার বলতে সাপ, ব্যাঙ, মাছ, কাঁকড়া, কচ্ছপ ইত্যাদি। সুদূর রাঙ্গামাটি থেকে ওরা দীন শেখার জন্য ঢাকায় এসেছে। সংখ্যায় ১২জন। ৫ জন পুরুষ, ৩ জন মহিলা আর ৪ জন শিশু। অল্প সময়ে কিছু দীনী তা'লীম নেয়ার জন্য মহিলাদেরকে আমাদের বাসায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা হল ওরা কী সব ইকিড়ি-মিকিড়ি ভাষায় কথা বলে কিচ্ছু বোঝা যায় না, তাহলে শেখাবো কীভাবে? আব্বু বললেন, দীনের মূল মূল কথা শেখা-শেখানোর জন্যে ভাষা না জানা কোন বাধা নয়। শোননি! সাহাবায়ে কেরাম আরব দেশ থেকে আমাদের এদেশে দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। আরবী ভাষা না জেনেও কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষগণ তাদের কাছ থেকে ইসলাম শিখেছিলেন এবং সে অনুযায়ী আমল করেছিলেন। কাজেই ইশারা-ইঙ্গিতে যতোটা সম্ভব শিখিয়ে দাও। আব্বুর কথায় সাহস পেলাম। ইশারা-ইঙ্গিতে নানাভাবে চেষ্টা করে আম্মু আর আমরা বোনেরা মিলে কিছু কিছু করে শেখাতে থাকলাম। দিনের শেষে যখন দেখলাম তারা কালিমা ও উযু-নামায শিখতে পেরেছে, বেশ ভালো লেগেছিল। পাহাড়ী মানুষ এই প্রথম ঢাকায় এসেছে বলে ওরা খুব আনন্দিত ছিল। আল্লাহর কাছে শোকরিয়া জানাই, অল্প হলেও অনুন্নত, অবহেলিত, সহজ-সরল এসব দীনী বোনদের জন্য সময় দিতে পেরেছি। তাদের সঙ্গে আনা শিশুদেরকে মাদরাসায় দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ্! এখন তারাসহ এসব উপজাতিদের ৫০জন বাচ্চা বিভিন্ন মাদরাসায় পড়ছে। তাদের মধ্যে মেয়ে শিশুও প্রায় ২৫জন। এ সব বাচ্চারা ইলমে দীন শিখে রাঙ্গামাটি ফিরে যাবে এবং নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ-ভাষায় দাওয়াতী মেহনত ও ইসলামের খেদমত করবে ইনশাআল্লাহ। এতে অনেক পরিবার ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে ধন্য হবে। দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা তাদের কুরবানীর উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

উম্মে সফওয়া
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

কি সুন্দর আমার প্রভুর সৃষ্টি

বৃষ্টি ভেজা সকাল। সফরে যাচ্ছিলাম। খুব দ্রুতবেগে গাড়ি ছুটে চলছিল। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। কাঁচের ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছিল আমার প্রভুর নিপুণ সৃষ্টি। পথের দু'পাশে সারিবদ্ধ বৃক্ষগুলো কী যে চমৎকার, নজরকাড়া আর হৃদয়ছোঁয়া! নবীজী বলেছেন, বৃক্ষরা আমার প্রভুর নির্দেশেই দণ্ডায়মান। বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল দিগন্তবিস্তৃত ফসলের মাঠ। যেদিকে তাকাই সবুজ আর সবুজ। সবুজ-শ্যামলে ঘেরা চারদিক যেন গল্পের সেই সবুজ দ্বীপ। দখিনা বাতাসে আন্দোলিত ফসলের মাঠগুলো দেখতে দেখতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'আহা কি সুন্দর আমার প্রভুর সৃষ্টি!'

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাসরুর
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

অপ্রাপ্তির বেদনা

বড় রাস্তার ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। হঠাৎ একটি দৃশ্যের উপর চোখ আটকে গেল। একজন বাবা তার ছেলেকে পরম আদরে বুকে টেনে নিচ্ছে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে কিছুক্ষণ থেমে রইলাম। মনের গহীনে একটা শূন্যতা অনুভব করলাম। জানি এবং ভালো করেই জানি, এই শূন্যতা কখনও পূরণ হওয়ার নয়। শুধু আজই নয়; যখনই কারও মুখ থেকে 'বাবা' ডাক শুনি হৃদয়ের মাঝে স্মৃতির এক পশলা হাহাকার বয়ে যায়। মনের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে 'আহা'। জানি, কষ্টের এ বোঝা আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে আজীবন। হ্যাঁ, এটাই সত্য। আমার জীবনের পুষ্পোদ্যানে যে 'বাবা' নামের ফুলটি নেই। যে ফুলটির ঘ্রাণ নিতে আমি শৈশব থেকেই চেষ্টা করেছি। আজও করছি, কিন্তু পাইনি। পাবো কি করে? সে যে আমার জীবন থেকে অনেক আগেই ঝরে গেছে। তাই এ ফুলের ঘ্রাণে মোহিত হওয়ার সুযোগ আমার কোনদিনই হবে না। এ ফুলকে কাছে গিয়ে ছুঁয়ে দেখার সুযোগও আমি পাব না। আর অপ্রাপ্তির এই বেদনা নিয়েই আমাকে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকতে হবে।

তবে যখনই পিতৃস্নেহ না পাওয়ার বেদনা আমাকে ব্যাকুল করে তোলে, অস্থির হয়ে যাই বাবার বিচ্ছেদের শোকে তখনই বাবার প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে উচ্চারণ করি আল্লাহ তা'আলার শেখানো বাণী-

'রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানী সগীরা'।

মুহাম্মদ ইফতিখার আহমাদ
আমীনবাজার, ঢাকা।

শরীফ এখন 'শরীফ'

শরীফের বাবা-মা বোধ হয় খুব আশা করেছিলেন যে, তাদের কোল আলোকিত করে জন্ম নেয়া সন্তানটি শান্ত-ভদ্র হবে। তাই তারা আদর করে পুত্রের নাম রাখলেন 'শরীফ', অর্থাৎ ভদ্র।

কিন্তু এই বয়সেই তার যা মেজায-মূর্তি তাতে যে কেউ তার নাম শোনেই আঁতকে ওঠে।

স্কুল থেকে ফেরার পথে স্যারের টাকে ঢিল ছুঁড়লো কে? শরীফ। বিকেলে খড়ের গাদায় আগুন লাগাল কে? শরীফ। খানদের গাছে চড়ে আম চুরি করল কে? সেই শরীফ। বলা চলে, গ্রামে অশান্তি-অনাসৃষ্টিকর যত কাণ্ড ঘটে প্রায় তার সবই শরীফের পাকা হতের কাজ।

এককথায়, শরীফের মত চপল-চঞ্চল কিশোর দশ গ্রামে একটাও পাওয়া যাবে না। তবে চঞ্চল হলেও শরীফ কিন্তু সবার কাছেই খুব প্রিয়।

কিন্তু কিছুদিন থেকে শরীফকে আর আগের মত চটপটে দেখা যায় না। এদিকে গ্রামের শেষ মাথায় বরই তলায় কি যেন হয়েছে। শেখ বাড়ির চপলমতি কিশোরের মতো এখানটাও যেন হঠাৎ করেই একেবারে প্রশান্ত হয়ে গেছে। এখন বরই তলায় প্রায়ই শরীফকে দেখা যায় উদাস চোখে আকাশ পানে চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে অশ্রুধোয়া মুখটা নামিয়ে নির্বাক তাকিয়ে থাকে একটি কবরের দিকে। এটা শরীফের মা'র কবর।

মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
জামালপুর।

প্রকৃতি দর্শন

যখন হারিয়ে যাই আকাশের নিঃসীম নীলিমায়; যখন বিমুগ্ধ হই পাখিদের কূজন-কলতানে; যখন চারপাশের প্রকৃতি দুলতে থাকে দখিনা হাওয়ায়; যখন সোনালী ধান ক্ষেতে নিলুয়া বাতাস বয়ে যায়; যখন জোয়ারের টানে নৌকা ছোটে উজানের পানে; যখন মধুর ঘ্রাণে মৌমাছিদল ছুটে আসে ফুলের পানে, যখন বসন্ত-ছোঁয়ায় সজীব হতে শুরু করে নির্জীব প্রকৃতি, যখন আঁধার ডিঙিয়ে উদিত হয় প্রভাত রবি– তখন কার প্রশংসা করব? কার গুণগান গাইব?

কাল বিকেলে প্রকৃতির মাঝে আত্মসমাহিত হতে গিয়েছিলাম। জায়গাটা জামি'আতুল আবরার থেকে সামান্য দূরে। যখন পৌঁছলাম ঘড়ির কাটা তখন ছয়টা ছুঁই ছুঁই করছে। পশ্চিমাকাশে দেখতে পেলাম সাত রঙে সাজানো এক বিশাল রঙধনু। মনে মনে বললাম, বন্ধু! বহু বছর পর দেখা হল তোমার সাথে। এসো কিছুক্ষণ একান্তে কথা বলি। নেই যেথা কোন কোলাহল কলরব। হেথা শুধু তুমি আমি রহিব সরব। ভাল লেগেছে কালকের আকাশ দেখে। মনে বয়ে ছিল আনন্দের হাওয়া, হেসেছিলাম মন খুলে, প্রাণ খুলে। এই আনন্দ ও খুশি সদা-সর্বদা বজায় থাকুক।

মুহাম্মদ সানাউল্লাহ
মানিকগঞ্জ।

আরো যাদের লেখা পেলাম...

মাসউদুল হক আবূ তালহা
পাইকগাছা, খুলনা।
ফয়জুর রহমান
লাখাই, হবিগঞ্জ।
মাহদী হাসান
ত্রিশাল, মোমেনশাহী।
ইবরাহীম খলীল
আশাশুনী, সাতক্ষীরা।
সাইফুল্লাহ
মতলব, চাঁদপুর।
সুলতান মাহমূদ
ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল।
ইলিয়াস হুসাইন
চাটমহর, পাবনা।
নূরে আলম
সদর, নীলফামারী।
আব্দুর রহীম
লালপুর, নাটোর।